একজন আরজ আলী

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

উৎসর্গ

রুহুল আমিন মজুমদারকে
শিল্পসাহিত্যের পৃষ্ঠপোষকতায়
বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকাকে যিনি
সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জ্যামিতিক আকারের ছোট মঞ্চে গ্যালিলিও একাকী বসে এখন। তাঁর দীর্ঘ পরিচ্ছদ মেঝেতে লুটিয়ে আছে। সচেষ্ট ভঙ্গিতে মেরুদণ্ড সোজা করে রাখা। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ঘরের এক কোণে ভূ-গোলকের উপর। ক্লান্তির ছায়া মুখমণ্ডলে। নেপথ্যে ঢোল-সহবতের পর ঘোষণা শোনা যায়।

"আমি গ্যালিলিও গ্যালিলি, ফ্লোরেন্স বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিদ্যা এবং গণিত শাস্ত্রের অধ্যাপক, এতদিন যা শিখিয়ে এসেছি সে সব প্রত্যাহার করছি। সূর্য সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থিত নয়। সূর্য নিয়ত ভ্রাম্যমাণ। পৃথিবীই বিশ্বের কেন্দ্রে এবং অনড় ও গতিহীন। এতদিন আমি যা বলে এসেছি, ছাত্র এবং অনুগামীদের শিক্ষা দিয়েছি তার কোনো ভিত্তি নেই। পবিত্র চার্চের কাছে আমি ক্ষমাপ্রার্থী। আমার ভুল হয়েছে"।

নেপথ্যে একজন উত্তেজিত স্বরে বলে উঠে, 'সত্যকে হত্যা করা হলো।'

অন্য একজনের উষ্মার সঙ্গে উক্তি, 'গ্যালিলিও কাপুরুষ। ভয়ে ভীত। তার বশ্যতা স্বীকার বিজ্ঞানের অপমান। এটা কী করে সম্ভব হয়?'

গীর্জার ঘণ্টা বেজে উঠে। ক্রমেই সেই ধ্বনি এগিয়ে আসে। সমস্ত মঞ্চ কম্পিত হয় ধাতব শব্দে। প্রচণ্ড রবে আলোড়ন তুলে ঘণ্টাধ্বনি হতে থাকে। আর কিছুই শোনা যায় না। গ্যালিলিওর মুখে ক্ষীণ হাসির রেখা জেগে উঠে। খুব ধীরে মঞ্চে আলো নিভে যায়। সরলরেখায় একটি আলোকরশ্মি উজ্জ্বল করে রাখে গ্যালিলিওর মুখ আর ভূ-গোলক।

হাসনাত বলল, ভাগ্যিস গ্যালিলিওর মুখে দাঁড়ি ছিল। না হলে আলী যাকেরকে তাঁর মুখের দাঁড়ি কামিয়ে ফেলতে হতো।

আলী নুর হেসে বলল, আলী যাকেরকে এ পর্যন্ত কোনো চরিত্রে অভিনয়ের জন্য দাঁড়ি কামাতে হয়নি।

রঙ করা হলেও বেশ বোঝা যায় ঘরটির বয়স প্রাচীন, ব্রিটিশ আমলের। মাথার উপর মস্ত বড় লোহার বিম, আড়াআড়িভাবে রাখা লোহার পাত, খসে পড়া সাদা রঙের ভেতর থেকে উঁকি দেয় জং ধরা লোহার ভ্রূকুটি। দেয়ালে পলেস্তারা পুরু হতে হতে নিজের ভারেই পড়ে যাবার উপক্রম। দরজার পাল্লায় খড়খড়িগুলো বন্ধ। মাথার উপর মস্ত আকারের ফ্যান ঘুরছে। দূরাগত ধ্বনির মতো শোনাচ্ছে ফ্যানের তৈল-তৃষিত শব্দ।

একজন আরজ আলী # ৪০৫

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিলের উপর বিভিন্ন পেপার ওয়েট, কয়েকটি ফাইল, অ্যাসট্রে। পাশের র‍্যাকে কালো বেড়ালের মতো অলস হয়ে শুয়ে থাকার ভঙ্গিতে টেলিফোন, তার পাশে খাকি রঙের মাথার টুপি, চামড়া বাঁধানো চকচকে স্টিক।

আরজ আলীর দৃষ্টি সবকিছু জরিপ করে নিয়ে স্থির হলো পেছনের দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখা পুরনো বড় ঘড়িটায়। হলুদ রঙের গোল পেণ্ডুলাম দুলছে যেন নৃত্যের তালে তালে। ডান থেকে বামে, বাম থেকে ডানে। শব্দ উঠছে টিক টিক, টিক টিক। সরব পেণ্ডুলামের বিরামহীন গতি, নির্ভুল তার দুদিকের যাত্রায় প্রান্ত থেকে প্রান্তে ফিরে আসা। আরজ আলী নির্নিমেষে তাকিয়ে থাকে। সমস্ত ঘরে এই একটি বস্তুই তাঁর মনোযোগ আকর্ষণ করে সবেচেয়ে বেশি। কী করে দুটি কাঁটার মাঝখানে সময়কে আটকে রাখা হয়েছে। কিন্তু সময় কি মাপা যায়? আরজ আলী ভাবে।

খুব বড় একটা টেবিলের ওপাশে পুরু গদিআঁটা চেয়ারে বসে এসপি সাহেব বললেন, তুমি তাহলে কমিউনিস্ট নও? এই বলতে চাও? তারপর একবার তাঁর সামনে খোলা ফাইলের উপর আর একবার আরজ আলীর দিকে তাকিয়ে তিনি উত্তরের অপেক্ষা করেন। বাইরে কাকের কর্কশ ডাক শোনা যায়। একটা ঘোড়ার হ্রেষাধ্বনি ভেসে আসে। ফেরিওয়ালা ডাকে। আকাশ উঁকি দেয় স্কাইলাইট দিয়ে।

আরজ আলী হাত বাঁধা অবস্থায় দাঁড়িয়ে থেকে বলল, না হুজুর। আমি কমিউনিস্ট না।

তবে যে তোমাকে কমিউনিস্ট বলে ধরে নিয়ে এসেছে। কমিউনিস্ট না হলে কেন ধরে আনবে? এসপি সাহেব তাকিয়ে থাকেন। তার মুখে ভ্রূকুটি।

তা আমি কী করে বলব হুজুর! যারা ধরে এনেছেন তাদেরকেই জিজ্ঞেস করেন।

আরজ আলীর মুখে স্মিত হাসি।

হাসি বন্ধ করো। তুমি কি মনে করো তোমার সঙ্গে মশকরা করছি আমি? এসপি সাহেব ধমক দেন।

আরজ আলী বলে, হুজুর আমার মুখটাই অমন। মনে হয় সব সময় হাসতে আছি।

বটে! ঠাট্টা করা হচ্ছে। হাজতে থেকেও শিক্ষা হয়নি মনে হচ্ছে।

আরজ আলী জিভ কাটে। তারপর বলে, ঠাট্টা করতে যাবো কেন হুজুর? যা সত্যি তাই বললাম।

এসপি কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে তাঁকে দেখে ফাইলের পাতা ওল্টান। তারপর বলেন, তোমার বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ। তুমি গ্রামে রাষ্ট্রদ্রোহিতামূলক কার্যকলাপ করছ। গ্রামের মানুষদের প্রচলিত ধর্মীয় রীতিনীতি আর আইনকানুনের বিরুদ্ধে খেপিয়ে তুলছ। সত্যি এ সব?

আরজ আলী হাতের বাঁধন আলগা করার চেষ্টা করে বলল, তেমন কিছু নয় হুজুর। বই-পত্র পড়ে যা জেনেছি সে সব শুনিয়েছি মাত্র। কারো বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করতে বলিনি।

কার লেখা বই পড়েছ? কার্ল মার্কস? এঙ্গেলস? এসপি তাঁর দিকে তীক্ষ্ণ চোখে তাকান।

না, হুজুর। এদের কোনো বই আমি পড়িনি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তবে। কাদের বই পড়েছ? কোন সব বইয়ের কথা তুমি গ্রামের লোকদের শুনিয়ে থাকো?

আরজ আলী হাত সামনে টেনে আনতে চায়। এসপি বলে, কথা বলতে অসুবিধা হচ্ছে?

হাজতে দুদিন বেদম পিটুনি খেয়ে আরজ আলীর সারা শরীরে ব্যথা। কিন্তু মুখে হাসি।

তা একটু হইতেছে বৈকি। হাজতে মারধোর করেছে।

এসপি নির্বিকার মুখে বলেন, এটাই রেওয়াজ। না হলে আসামী মুখ খুলতে চায় না। ব্রিটিশ আমল থেকেই এমন চলে আসছে। তা এখন বলো দেখি কার কার বই পড়েছ?

এই তো স্যার সামান্য কয়েকজনের বই। খুব বেশি বিজ্ঞানের বই তো বাংলায় লেখা হয়নি। আর ইংরেজি পড়ার ক্ষমতা তো নেই আমার। আরজ আলী সংকুচিত হয়ে বলে।

তোমার বেশি কথা বলার অভ্যাস। লেখকের নাম বলো দেখি কার কার বই পড়ো, কোথায় পাও সেই সব বই? এসপি সাহেবের এবার রাগত স্বর।

রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদীশচন্দ্র বসু, খগেন্দ্রনাথ মিত্র, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, আরজ আলী বলতে থাকে।

এসপি সাহেব তাঁকে থামিয়ে বলেন, এত দেখছি সবই হিন্দুর লেখা। নিশ্চয়ই পাকিস্তান বিরোধী কথা আছে ওদের বইতে।

না, হুজুর। তারা সব বিজ্ঞানের উপর লিখেছেন।

বিজ্ঞান? এসপি ভ্রূ কুঁচকে তাঁর দিকে তাকান।

জি, হুজুর। বিজ্ঞান। ভূতত্ত্ব, প্রাণিবিদ্যা, জ্যোতির্বিদ্যা এইসব বিষয়ে লেখা।

তুমি এইসব কেন পড়ো? জানি তুমি একজন চাষী। নিজ হাতে হাল দাও। তোমার এ সব বই পড়ে কী লাভ?

সত্যকে জানার জন্য আমার মনে জীবন আর জগৎ সম্বন্ধে অনেক প্রশ্ন। সেই ছোটবেলা থেকে। এদের বই থেকে অনেক প্রশ্নের উত্তর পাই। সত্য জানতে পারি।

সত্য কী? এসপি'র মুখে ভ্রূকুটি বড় হয়।

সত্য হলো যা প্রমাণ করা যায়। আরজ আলী হাসি মুখে দাঁড়িয়ে থাকে।

এসপি বললেন, সত্যকে মিথ্যা এমনে করা যায়; মিথ্যাকে সত্য।

হুঁ। তা কোথায় পেয়েছ এইসব বই? এসপি আবার তার ফাইলের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করেন।

বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরি, শঙ্কর লাইব্রেরি, ব্যাপটিস্ট মিশন লাইব্রেরি, ব্রজমোহন কলেজ লাইব্রেরি। আরজ আলী মুখস্থের মতো বলে যায়।

এত লাইব্রেরি আছে নাকি বরিশাল শহরে? অজ পাড়াগাঁর মতো এই শহরে বইপত্র পড়ে কারা? এসপি সাহেব অবাক হন। তারপর আরজ আলীর দিকে তাকিয়ে বলেন, তোমাকে আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। তবে তুমি যে কমিউনিস্ট নও সেটা স্পষ্ট। তোমার বিরুদ্ধে প্রধান যে অভিযোগ তার প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তুমি মার্কস, এঙ্গেলস পড়োনি, অবশ্য তাদের বই বোঝার ক্ষমতা তোমার আছে কিনা জানি না। যাক সে কথা, যা বলছিলাম, তুমি পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সাবভার্সিভ, মানে ধ্বংসাত্মক কিছুতে লিপ্ত আছ তাও মনে হচ্ছে না। কমিউনিস্টদের মতো "ইয়ে আজাদী ঝুটা হায়" বলে স্লোগান দিয়েছ বলেও শোনা যায়নি। হুঁ। বলে তিনি চিন্তা করতে থাকেন।

তাহলে আমি নির্দোষ হুজুর? আরজ আলী তার বাঁধা হাত টেনে সোজা করার চেষ্টা করে। শক্ত দড়ি হাতের মাংসে দাঁত বসায়। দুরাত্রির পর এখন এই সামান্য ব্যথা তাকে খুব কাতর করে না।

নির্দোষ? বলে এসপি কিছুক্ষণ তাঁর দিকে তাকিয়ে থাকেন। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, দোষী প্রমাণ করা যাচ্ছে না। কিন্তু নির্দোষ তাও তো বলা যাচ্ছে না।

আরজ আলী হেসে বলে, হুজুর এ হতে পারে না একটা মানুষ হয় দোষী, নয় নির্দোষ। এটাই সত্যবাদ। বইপত্রে তাই বলে। মানে, দুটো জিনিস একসঙ্গে সত্য হতে পারে না।

এসপি সাহেব মাথা নাড়েন। তারপর বলেন, বইপত্র অনুযায়ী যদি শাসন কাজ চালান হয় তাহলে আইন শৃঙ্খলা থাকবে না আরজ আলী মাতুব্বর।

এই প্রথম তিনি আরজ আলীর পুরো নামটা উচ্চারণ করেন। তাঁর মুখের কাঠিন্য এখন কিছুটা শিথিল হয়ে এসেছে। তাঁর দৃষ্টি এখন অনেক স্বাভাবিক মনে হচ্ছে। তিনি ঘাপটি মেরে বসে থাকা বেড়ালের মতো কালো টেলিফোন নিয়ে ঘোরালেন। তারপর বললেন, করিম সাহেব, আপনার আসামীকে দুদিন থেকে ইনটারোগেট করা হয়েছে। আমি নিজেই এখন তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বললাম। কমিউনিস্ট বলে মনে হচ্ছে না। মার্কস এঙ্গেলসের নামই শোনেনি মনে হচ্ছে। কি সব ভূতত্ত্ব, জ্যোতির্বিদ্যা এইসব বই পড়েছে। যদিও হিন্দু লেখকদের লেখা। বিজ্ঞানের বই, সাবভার্সিভ কিছু থাকার কথা না। তবু আমরা দেখে নেবো।

কী বললেন? অপ্রচলিত কথাবার্তা বলছে? গ্রামের লোকের ধর্মীয় বিশ্বাস আর সংস্কারে আঘাত দিচ্ছে? পেনাল কোডের কোন ধারায় ফেলা যায় এইসব? মনে করতে পারছেন না? আরে ইংরেজ সাহেবদের কথা রাখুন। তারা তো সাবভার্সন বলে সবকিছু এক করে দেখেছে। হ্যাঁ, হ্যাঁ। সন্দেহজনক হলেই ডিটেনশন দিচ্ছি আমরা। কিন্তু এই লোকটা, মাতুব্বরকে, দেখে মনে হচ্ছে এখনই তার প্রয়োজন নেই। ছেড়ে দেওয়া যায়।

এর পর কিছুক্ষণ তিনি টেলিফোনে ওপাশের কথা শোনেন। মাঝে মাঝে মাথা নাড়েন। টেবিলের উপর পেপারওয়েটগুলো অকারণেই নাড়াচাড়া করেন। তারপর বলেন, লেট মি হ্যান্ডল দিস।

তিনি টেলিফোন রেখে দিয়ে ভ্রূ কুঁচকে তাকিয়ে বলেন, কিছু বুঝতে পারছ আরজ আলী মাতুব্বর? হাকিম নড়ে তো, হুকুম নড়ে না। শুনেছ এ কথা? এ সম্বন্ধে কী বলে তোমার সত্যবাদ?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টেবিলে দুহাত রেখে সামনের দিকে ঝুঁকে থাকেন এসপি সাহেব। যেন আরজ আলীর কথা ভালো করে শোনার জন্যই। তারপর ফাইলে খসখস করে কিছু লেখেন। একটু পর মুখ তুলে বলেন, তোমাকে ডিটেনশনে পাঠাতে পারি। এর জন্য কোনো কেইস হবে না, সাক্ষী-সাবুদ লাগবে না। তুমি জেলে থাকবে ডেটেন্যু হয়ে। পেনাল কোডের ৮৪ ধারাতেও জেলে পাঠানো যায় তোমাকে কোনো বিশেষ অভিযোগ ছাড়াই। করিম সাহেব, যার আদেশে তোমাকে অ্যারেস্ট করা হয়েছে, তিনি তেমনটিই চাচ্ছিলেন। আমি তোমার সঙ্গে কথা বলে একটা জিনিস বুঝতে পেরেছি। তা হলো এই যে, তুমি ক্রিমিনাল নও, কমিউনিস্টদের মতো সাবভার্সিভ এলিমেন্টও নও। কিন্তু করিম সাহেব যা বললেন, সেটিও গুরুতর। মানুষের প্রচলিত বিশ্বাস, আচার-অনুষ্ঠান, সংস্কারে আঘাত দিলে সমাজের স্থিতিশীলতা বজায় থাকে না। সুতরাং তুমি যত ইচ্ছা বই পড়ো, জ্ঞান অর্জন করো ক্ষতি নেই। কিন্তু সে সব নিয়ে কোনো আলোচনা করতে পারবে না। তুমি বইপত্র পড়ে যা জানবে তা প্রচার করবে না এই প্রতিশ্রুতি যদি দাও তাহলে তোমাকে ছেড়ে দিতে পারি। বলে তিনি তীক্ষ্ণ চোখে তাকালেন আরজ আলীর দিকে।

আরজ আলীকে খুব চিন্তান্বিত দেখালো কিছুক্ষণের জন্য তারপর সে বলল, বেশ তাই করব। যে জ্ঞান আমি অর্জন করব তা প্রচার করব না। তারপর একটু থেমে বলল, হুজুর, ঐ সব বইতেই পড়েছি সত্যের জয় অবশ্যম্ভাবী আপনি না চাইলেও সত্যের জয় হবে।

তা হোক। আমাদের দিয়ে না হলে ভালো। বিশেষ করে সেইসব সত্য যদি হয় খুবই ঝামেলাপূর্ণ। এসপি সাহেব অসহিষ্ণু হয়ে বলেন।

একটা সেপাই এসে আরজ আলীর হাতের বাঁধন খুলে দেয়। আরজ আলী হাত দুটো সামনে এনে সোজা করতে করতে বলে, হুজুর, আর একটা ব্যাপারও আছে। আজকে যা মিথ্যে বলা হচ্ছে, ভবিষ্যতে তাই সত্যি বলে গ্রহণ করতে পারে রাষ্ট্র, সমাজ।

এসপি সাহেব চেয়ারে হেলান দিয়ে বলেন, আমরাও সেই সত্যকে সমর্থন করব তখন। সত্যের সমর্থনে সমসাময়িক হওয়াই টিকে থাকার প্রধান শর্ত। এ কথা মনে রেখো আরজ আলী মাতুব্বর। এখন যাও। তোমার ফাইল এই আমি ক্লোজ করলাম। দেখো আবার যেন রি-ওপেন করতে না হয়।

আরজ আলী পেণ্ডুলামের দিকে তাকায়। টিকটিক শব্দ তুলে দুই প্রান্তে অবিরাম একই গতিতে আসছে, যাচ্ছে। সময় এগুচ্ছে। আরজ আলী তার পদধ্বনি শুনতে পায়।

কালচারাল সেন্টারে শূন্য প্রেক্ষাগৃহে দুজন বসে আছে। শূন্য মঞ্চের দিকে তাকিয়ে আলী নুর বললেন সক্রেটিস তার দর্শনকে প্রত্যাহার করেননি। অটল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকেছেন নিজের বিশ্বাসে এবং প্রচার করেছেন যা মনে করেছেন সত্য বলে। হেমলকের পেয়ালা পান করে চরম মূল্য দিয়েছেন তিনি। কিন্তু গ্যালিলিও তা করেননি। ইনকুইজিশনের কাছে তাঁকে বশ্যতা স্বীকার করতে হয়েছে। তাঁর প্রচারিত বৈজ্ঞানিক সত্যকে প্রত্যাহার করে নিয়েছেন তিনি। বেশ তফাৎ আছে দুজনের মধ্যে।

এইজন্যে কি তাকে কাপুরুষ কিংবা ছোট মাপের মানুষ মনে হয় না? হাসনাত তাকায়। ঘরে একজন লোক বাতি নেভাতে ব্যস্ত তখন।

আলী নুর বললেন, সত্যের জন্যই তাকে সেই পরাজয় মেনে নিতে হয়েছে। হতাশ করতে হয়েছে অনুগামীদের। যদি রিক্যান্ট করার পর তিনি আর বিজ্ঞান চর্চা না করতেন এবং তার 'ডিসকর্সি' না লিখতেন তাহলে অবশ্যই তিনি একজন সাধারণ কাপুরুষ বলেই চিহ্নিত হতেন। কিন্তু সে তো তিনি করেননি। প্রতিশ্রুতি দিলেও গোপনে বিজ্ঞান চর্চা করেছেন, লিপিবদ্ধ করেছেন এবং একদিন অনুগত একজনকে দিয়ে দেশের বাইরে পাঠিয়েও দিতে পেরেছেন। শেষ অবধি তিনিই জিতেছেন। চার্চ নয়, ইনকুইজিটররা নয়। বিজ্ঞানের জয়যাত্রা থেমে যায়নি। যুদ্ধের মতো গ্যালিলিওর আত্মসমর্পণ একটা সময়িক রিট্রিট। নাটকটা দেখে তাই মনে হলো না?

হাসনাত বলল, আমাদের দেশে পাকিস্তান আমলে প্রায়ই শোনা যেত অমুক রাজনৈতিক কর্মী জেল থেকে বন্ড লিখে বেরিয়ে এসেছেন। রাজনৈতিকভাবে যারা সচেতন তারা কিন্তু ঐ সব রাজনৈতিক কর্মীদের সুনজরে দেখেনি। সপ্রশংস দৃষ্টিতে তো নয়ই। তাদের ব্যাপারে কী বলা যায়? মানে, যদি গ্যালিলিওর জীবনের সঙ্গে কোনো তুলনা করি আমরা। অবশ্য গ্যালিলিওর সঙ্গে সত্যি আর কারো তুলনা চলে না। কিন্তু নীতির দিক দিয়ে দেখলে?

আলী নুর বললেন, সে তো ঠিকই। কোনো দুটি মানুষই এক নয়। আর গ্যালিলিওর মতো বিশাল, সকল ব্যক্তিত্বের তুলনা হাস্যকর মনে হবে অনেকের কাছে। কিন্তু এই মুহূর্তে একজনের কথা মনে পড়ছে যার সঙ্গে গ্যালিলিওর জীবনের মূল ঘটনার বেশ কিছু মিল আছে। তিনি অবশ্য কোনো রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব নন। শিক্ষিত নন।

কী? হাসনাত তাকায়। ঘরের মধ্যে লোকটি শুধু একটি বাতি রেখে বাকি সব নিভিয়ে ফেলেছে।

আলী নুর বললেন, বরিশালের আরজ আলী মাতুব্বর।

শুনে হাসনাত ভ্রূ কুঁচকালো। তারপর বলল, ঠাট্টা করছেন নাকি? একজন মাতব্বর?

আলী নুর বললেন, সেই রকমই শোনাবে। কিন্তু ঐ যে বললাম, গ্যালিলিওর জীবনের মূল ঘটনার সঙ্গে তার জীবনের সাদৃশ্য আছে, যদিও বিশদ বর্ণনা আর ডিটেইলসে অনেক পার্থক্য। হয়তো এই নাটক এখানে না দেখলে এই তুলনার কথা মনেও হতো না।

কে ছিলেন আরজ আলী মাতব্বর? হাসনাত তাকায় গলা ঘুরিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলী নুর বললেন, মাতব্বর নয় মাতুব্বর। বরিশাল শহর থেকে প্রায় আট কিলোমিটার দূরে কীর্তনখোলা নদীর পাশে লামচরি গ্রাম। সেই গ্রামের একজন কৃষক আরজ আলী মাতুব্বর। মক্তবে দ্বিতীয় শ্রেণী পর্যন্ত পড়েছেন। জীবন সংগ্রামে ব্যস্ত থেকেছেন আমৃত্যু। নিজ উদ্যোগে পড়াশুনা আর জ্ঞানচর্চা করেছেন। সংস্কার মুক্ত স্বাধীনচেতা একজন মানুষ। কয়েকটি বই লিখে সারা দেশে আলোড়ন তুলেছেন। অপ্রচলিত কথা বলে চমকে দিয়েছেন অনেককে।

তাঁর সঙ্গে আপনার পরিচয় হলো কীভাবে? হাসনাত জানতে চাইল। সে ক্রমেই উৎসুক হয়ে উঠছে।

বরিশালে, অধ্যাপক শামসুল হক পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলেন। আলী নুর জানালেন। তারপর বললেন, তার সম্বন্ধে পথে যেতে যেতে বলব। এখন উঠুন। ওরা মনে হয় ঘর বন্ধ করবে।

হাসনাত সামনে তাকালো, মেঝে থেকে সামান্য উঁচু করে তৈরি কাঠের পাটাতনের আকার চৌকোণা নয়। ঘরের স্পেসের সঙ্গে মিলিয়ে বেশ অদ্ভুতভাবে কাটা, মঞ্চের উপরটা প্রায় আসবাববিহীন, খুব সাদামাটা। পাশে দুটি লোক দাঁড়িয়ে আছে। যেন নাটকের লব-কুশ।

হাসনাত নিজের মনে বলার ভঙ্গিতে বলল শূন্য মঞ্চ খুব বিষণ্ন দেখায়।

কেন? আলী নুর তাকলেন।

শূন্য বলে। হাসনাত বলল।

কল্পনা করা যাক। এই তো দেখতে পাচ্ছি সক্রেটিস, গ্যালিলিও... । বলে একটু থামলেন। তারপর আস্তে করে বললেন, আরজ আলী মাতুব্বর।

কী বললেন? হাসনাত ঝুঁকে তাকালো তাঁর দিকে।

আলী নুর অন্যমনস্কের মতো বললেন, কিছু না।

AMARBOI.COM

বিবর্ণ ছিঁড়ে যাওয়া এক্সারসাইজ খাতার আকারে হাতে সেলাই করা চারটি পাণ্ডুলিপি সামনে বিছিয়ে রেখে খুব বিনয়ের সঙ্গে যেন বা কিছুটা সংকোচেই তিনি বসে থাকেন। শামসুল হক একটি পাণ্ডুলিপি হাতে তুলে নেন। উপরে মাঝারি অক্ষরে নীল কালিতে লেখা 'ভিখারির আত্মকাহিনী' মাঝখানে লেখা প্রথম খণ্ড পৃষ্ঠা ১ থেকে ৮০। নিচে নাম আরজ আলী মাতুব্বর। ভেতরের পৃষ্ঠায় ছোট ছোট বাক্য।

"শহর বরিশালের প্রায় ছয় মাইল উত্তর পূর্ব কীর্তনখোলা নদীর পশ্চিম তীরে চরবাড়িয়া লামচরি গ্রামটি অবস্থিত। সাধারণ্যে ইহা 'লামচরি' নামে পরিচিত। গ্রামটির বাস দেড়শতের বেশি নয়। গ্রামটি ছিল খুবই নিচু চর। এ গ্রামে লোকের আবাস শুরু হয় মাত্র ১২৬২ বাংলা সাল হতে। নবাগত বাসিন্দাদের মধ্যে সমস্তই ছিলেন কৃষক। এই নবাগত বাসিন্দাদের মধ্যে ছিলেন আমানুল্লাহ মাতুব্বর এবং

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আর দ্বিতীয় জন হল এন্তাজ আলী মাতুব্বর, আমার পিতা। মা বলেছেন আমার জন্ম ১৩০৭ সালের ৩রা পৌষ।"

শামসুল হক অবাক হয়ে বললেন, সন তারিখ মনে রাখলেন কী করে? আরজ আলী বিনীত হেসে বললেন আমি চেষ্টা করেছি সব ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখতে। আমি দিনপঞ্জিকা লিখেছি নিয়মিত। এই যে আজ আপনার সঙ্গে আলাপ হল এটাও লেখা থাকবে। শামসুল হক মুগ্ধ হয়ে বললেন, আপনাকে যতই দেখি আপনার কথাবার্তা যতই শুনি ততই অবাক হই। বলুন দেখি আপনি যা বলছিলেন।

আরজ আলী এবারে পাণ্ডুলিপি থেকে নয়, নিজ মুখেই বলতে থাকলেন, তেরশ বঙ্গাব্দের শুরুতে যখন কীর্তনখোলা নদীর বাঁকে জলাভূমি থেকে ধীরে ধীরে চর জেগে ওঠে তখন আমার দাদা আমানুল্লাহ মাতুব্বর শেষ জীবনে চরে এসে বসত গড়ে তোলেন। এক ঘর দু ঘর করে আবাদ হতে থাকে। মানুষজন বাড়তে থাকে। ঐ ভাবে দাদার বসত বাড়ির পাশে চরের জমিতে চাষাবাদ শুরু করে আমার পিতা এন্তাজ আলী মাতুব্বর। তিনি সরল প্রকৃতির ছিলেন বলে বিষয় সম্পত্তির ব্যাপারে তেমন কিছু করে যেতে পারেননি। তাঁর বড় ভাইরা এ বিষয়ে চতুরতার সঙ্গে বেশ কৃতকার্য ছিলেন। আমার পিতা যখন মারা যান তখন আমার চার বছর। ইংরেজি সন ১৯০৫, বাংলা ১৩১১। মৃত্যুর সময় আমার পিতা আমাদের ভাইবোনদের জন্য রেখে যান ৫ বিঘা আবাদি জমি আর টিনের দুটি বসত বাড়ি। বিধবা মা লবেজান বিবি আমাকে আর আমার বোন কুলসুমকে নিয়ে বেশ বিপদে পড়লেন। দুজনেই ছোট। আমি ক্ষেতখামারে কোনো কাজে লাগি না। মা বাধ্য হয়ে বর্গা দিয়ে জমি চাষ করলেন। সেখানেও বিধি বাম। পরপর কয়েক বছর বন্যায় ফসল নষ্ট হলো। ক্ষেতের ফসল হারিয়ে ভাঙা সংসারের হাল তাঁর হাতছাড়া হবার যোগাড়। অনাহারে, অর্ধাহারে দিন কাটতে লাগল। পথের ভিখেরি হবার অপেক্ষা শুধু। আমার বিধবা মা চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন।

আমার পিতা ছিলেন লাকুটিয়ার জমিদার রায়দের প্রজা। তাঁর মৃত্যুর ছয় বৎসর পর আমার মা জমির খাজনা দিতে না পারার জন্য পৈতৃক পাঁচ বিঘা জমি হারালেন। প্রথমে জমিদার খাজনা আদায়ের জন্য পাইক বরকন্দাজ দিয়ে অত্যাচার, সন্ত্রাস চালিয়েছেন কিছুদিন। তারপরও খাজনা না পাওয়ায় জমি নিলামে দিয়ে দখল নিয়েছে।

আরজ আলী বলতে থাকেন, ধার কর্জ করে মা সংসার চালাতে চেষ্টা করলেন। পাড়া প্রতিবেশীর বাড়িতে ঢেঁকিতে ধান ভানা, রান্নার কাজে সাহায্য, কাপড়চোপড় ধোয়া এইসব দাসীগিরির কাজ ছাড়াও মাঝে মাঝে পেতেন পোয়াতি মেয়েদের প্রসবের সময় দাইয়ের কাজ। এমনকি মুর্দা মেয়ের লাশ গোসলের কাজও করেছেন পেটের দায়ে। এ সব করে নিয়মিত আয় হয় না। তাই ধার কর্জের প্রয়োজন পড়ে। গ্রামের লোকই মাকে বরিশালের সুদখোর মহাজন জনার্দন সেনের খবর দিল। পেটের তাগিদে, ছেলেমেয়েদের মুখের দিকে তাকিয়ে মা চড়া সুদে টাকা ধার করলেন। পরের বছরই জনার্দন সেন দেনা শোধ করতে না পারার জন্য আমাদের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

টিনের বাড়িটি নিলাম করে নেয়। খোলা আকাশের নিচে পড়ে থাকে ভিটে মাটিটুকু। উন্মুক্ত আকাশের নিচে শূন্য ভিটেয় বসে, মাটিতে আছড়ে কয়েকদিন কান্নাকাটি করলেন মা। হয়তো তখন তার স্বামীর কথা মনে পড়েছে, আমাদের দুঃখকষ্টের কথা ভেবেছেন। দূর সম্পর্কের আত্মীয়স্বজন আর পাড়া প্রতিবেশীদের বোধকরি মার আহাজারি দেখে সহানুভূতি হলো। তারা কৃপা করে পুরনো ভিটের উপর তৈরি করে দিল এক চিলতে একটা ঘর। ঘরটির দৈর্ঘ্য ছিল ছয় হাত আর প্রস্থ পাঁচ হাত। ঘরের চাল ধৈঞ্চার, ছাউনি গুয়া পাতার, চার কোণে মাদার গাছ কেটে খুঁটি বসানো হলো। ঢেঁকি লতা দিয়ে বাঁধা হলো খেজুর পাতার বেড়া। ঘর না বলে গরু ছাগলের খোয়াড় বললেই মানায় বেশি। ঐ ঘরে আমরা তিন জন, মা, আমি আর বোন কুলসুম থাকি। রান্না, খাওয়া দাওয়া আর শোওয়া সবই ঐ ছোট ঘরে। দীনহীন সংসারের সামান্য জিনিসপত্রও থাকে ঘরের ভেতরে। রান্নার হাঁড়ি-পাতিল, পানির কলসি, সানকি, আধাভাঙা কাচের গ্লাস, মাটির চুলা, ছেঁড়া লুঙ্গি, শাড়ি, গামছা, চাটাই আর তেলচিটচিটে ময়লা একটা বালিশ, এইসব ঘরের চারদিকে ঘরে লাগোয়া হয়ে থাকে।

একটু তাকালেন আরজ আলী। তাঁর লেখা 'ভিখারির আত্মকাহিনী' পাণ্ডুলিপি সযত্নে নেড়ে-চেড়ে দেখলেন।

শামসুল হক বললেন, খুবই কষ্টে কেটেছে ছেলেবেলা আপনার।

আরজ আলী বলতে থাকলেন, কোনো রাতে ঘুমের ঘোরে পা লেগে ঘরের একপাশে রাখা পানির কলসি ভেঙে গিয়ে ঘরময় পানি ছড়িয়ে কাঁথা-বালিশ এইসব ভিজে গিয়েছে। আবার কোনো দিন হাঁড়িতে রাখা পান্তাভাত ঘুমন্ত অবস্থায় হাতে লেগে ঘরময় ছড়িয়ে পড়েছে। আমার বেশ মনে পড়ে ঐ সময় আমাদের দু-বেলা খাবার জুটত না। সকালে থেকে এঁটে কলা দিয়ে পান্তাভাত। মা যদি লোকের বাড়ি কাজ করে ভাত আনতে পারতেন তাহলে রাতে খাওয়া হতো। তিনি কখনো সানকি ভরে ভাত-ছালুন আনেন। কখনো শাড়ির আঁচলে দুমুঠো চাল, হাতে এক ফালি বেগুন কিংবা দু-টুকরো শুটকি মাছ। সকাল থেকে সন্ধ্যা হাড়ভাঙা পরিশ্রম করতেন মা। আমি এক সময়ে সংসারে সাহায্য করার জন্য অন্যের গরুবাছুর নিয়ে মাঠে চরাতে শুরু করলাম। আমার বয়স তখন পাঁচ।

শামসুল হক বললেন, পড়াশুনা শুরু করলেন কীভাবে? যা বললেন তাতে স্কুলে যাওয়ার সুযোগ ছিল বলে মনে হয় না।

আরজ আলী সোজা হয়ে বসলেন। জ্বলজ্বলে চোখে তাকালেন সামনের দিকে। যেন শুধু শামসুল হক নয় অনেককেই দেখতে পাচ্ছেন তিনি। তারপর আস্তে আস্তে বলতে থাকেন।

লামচরি গ্রামে কোনো স্কুল ছিল না। থাকলেও আমার যাওয়ার সাধ্য হতো না। তখন প্রতি ইউনিয়নে ছিল প্রাইমারি স্কুল, যার নাম ছিল বোর্ড স্কুল। কেননা শিক্ষা বোর্ড সে সব স্কুল চালাতো তখন। আমাদের ইউনিয়নের বোর্ড স্কুল ছিল

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

চরবাড়িয়ায়। আর বরিশালে ছিল হাইস্কুল। ১৩৩৪ সালের লামচরির কেউ বোর্ড স্কুলে যায়নি। ঐ সালে লামচরি গ্রামের আব্দুল আজিজ মাতুব্বর আর ফজলুর রহমান মৃধা চতুর্থ ও পঞ্চম শ্রেণীতে ভর্তি হয়। যাক যা বলছিলাম, লামচরিতে কোনো স্কুল ছিল না। গ্রামের অবস্থাপন্ন কৃষকদের কেউ কেউ বাড়িতে মুন্সি ধরনের বিদেশী আলেম রাখতেন। তাদের কাজ ছিল নামাজ পড়ানো। আর সকাল বিকাল কর্তার ছেলেমেয়েদের বাংলাও পড়াতেন বা মুখে মুখে কলেমা, ছুরা, কেরাত ও নামাজ শিক্ষা দিতেন। কেউ পাড়াপ্রতিবেশীদের ছেলেমেয়েদেরও পড়াতেন। কাউকে নিয়মিত বেতন দিতে হতো না। খাওয়া বা লুঙ্গি, গামছা দিলেই হতো। তখন বিবাহ, তালাক, কাবিন কুচিৎ শহরে হতো, শরিয়তের প্রায় সব কাজই ছিল গ্রামে। তাই আলেম, মুন্সিদের ছিল একচেটিয়া ব্যবসা। কলেরা, বসন্ত মহামারী লেগে গেলে তো কথাই নেই, জানাজার কাজে দারুণ ব্যস্ত থাকতে হতো তাদের।

দক্ষিণ লামচরি নিবাসী কাজেম আলী সরদার সাহেব এমন একজন মুন্সি রেখেছিলেন তাঁর বাড়িতে ১৩১৯ সালে। তাঁর নাম ছিল মুন্সি তাহের আলী। গ্রামের ছেলেমেয়েদের পড়ার জন্য অভিভাবকদের আমন্ত্রণ জানানো হলো। আমার মাকেও বলা হলো। মা জানালেন, মক্তবের বেতন দেওয়ার সামর্থ্য তাঁর নেই। তখন সরদার সাহেব বললেন যে, বিনা বেতনেই আমাকে পড়তে দেওয়া হবে আর প্রথম বছর বইপুস্তক লাগবে না। তালপাতা আর কলা পাতাতে চলবে। সিদ্ধ তালপাতা ও খাগের কলম নিয়ে মক্তবে যাওয়া শুরু করলাম। প্রথম দিনের কথা স্পষ্ট মনে আছে। মুন্সি সাহেব একটা সুচালো লোহা দিয়ে তাল পাতায় স্বর ও ব্যঞ্জন বর্ণ এঁকে দিলেন এবং পড়া বলে যেতে থাকলেন। স্বরবর্ণ ও ব্যঞ্জনবর্ণ পড়তে, লিখতে প্রায় এক বছর লেগে গেল।

মুন্সি তাহের আলী একদিন মক্তব বন্ধ করে তার গ্রাম মুলাদী চলে যান। আর ফিরলেন না। পরে শোনা গেল যে তিনি কলেরায় মারা গিয়েছেন। এর পরের বছর ১৩২০ সালে স্থানীয় মুন্সি আব্দুল করিম তার শ্বশুর আবদুর করিম সাহেবের বাড়িতে একটি মক্তব খোলেন এবং পড়ার জন্য ছেলেমেয়েদের ডাক দিলেন। বেতন ধার্য করলেন চার আনা। মা বেতন দিতে পারবেন না, টাকা নেই, তাই আমার যাওয়া হলো না। মুন্সি সাহেব একদিন বাড়িতে এসে মাকে বললেন, বেতন লাগবে না। তখন আমি আবার মক্তবে যাওয়া শুরু করলাম। এই হলো আমার শিক্ষা জীবনের দ্বিতীয় পর্ব। বানান ও 'ফলা' লেখা শুরু হলো কলাপাতায়। লিখতে হতো বাঁশের টুনী-র কলম, কালি জুটত না বলে মেটে দোয়াতে লেমের কালি। চালপোড়ার বাটা ও ভুঙ্গরাজের পাতার রসে তৈরি কালি ব্যবহার করতাম। এরপর একদিন মুন্সি সাহেব বললেন, একটা "আদর্শলিপি" বই ও শ্লেট লাগবে। শুনে মা বললেন, পয়সা কই বাপ?

শামসুল হক বললেন, মুন্সি সাহেব বেতন মাফ করতে পারলেন, বইপত্র দিতে পারলেন না?

না। তা কী করে দেবেন? নিজের টাকাতেই বলতে গেলে মক্তব চালাচ্ছেন। ছেলেমেয়েদের কাছ থেকে যে বেতন পান তাতে অর্ধেকও খরচ জোটে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তাই শখ করেই মক্তব দিয়েছিলেন। কোনো ব্যবসা-বুদ্ধি ছিল না। গ্রামে বিত্তবান ছিল অনেকেই, কিন্তু মক্তবটির সাহায্যের জন্য এগিয়ে আসেননি। থাক সে কথা। আমি কিন্তু একদিন হঠাৎ করেই বই পেয়ে গেলাম। বলে আরজ আলী চেয়ারে হেলান দিয়ে বসলেন। তাঁকে খুব সুখী দেখাচ্ছে। যেন সেই বই এখন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছেন।

কীভাবে বই পেয়ে গেলেন? শামসুল হক খুব কৌতূহলী হয়ে পড়েন। তিনি আরজ আলী মাতুব্বরের তীক্ষ্ণ চোখের দিকে তাকান। একজোড়া চোখ তাঁকে দারুণভাবে আকর্ষণ করে। গভীর দৃষ্টি চোখ দুটিতে কিন্তু কোনো জ্বালা নেই। তার বদলে অপার্থিব এক প্রশান্তি বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এমন গভীর অন্তর্ভেদী দৃষ্টি তিনি কেবল দেখেছেন রবীন্দ্রনাথের, বিবেকানন্দের, নজরুলের প্রতিকৃতিতে। আরজ আলী তাঁর দৃষ্টিতেই সম্মোহন করেন। কথা বলতে শুরু করলে সেই আকর্ষণ বাড়ে।

আরজ আলী বললেন, একদিন এক দূর সম্পর্কের চাচা এসে দেখলেন আমি কলা পাতায় কঞ্চি দিয়ে লিখছি। তিনি কৌতূহলী হয়ে দেখে বললেন, বাহ, তোর অ আ অক্ষর লেখা তো বেশ সুন্দর। কোন বই পড়িস?

আমি বললাম, কোনো বই নাই। ক্লাসে অন্যদের বই দেখে যা মনে থাকে তার থেকে লেখি।

শুনে সেই জ্ঞাতি চাচা মুহব্বত আলী মাতুব্বর দুআনা দিয়ে সীতারাম বসাকের লেখা "আদর্শলিপি" বইটা কিনে দিলেন। এটা মক্তবে ভর্তি হবার কয়েক মাস পরের ঘটনা। জ্ঞাতিভাই হামজা আলী মাতুব্বর দিলেন তাঁর একখানা ভাঙা শ্লেটের আধখানা অংশ। আমি পেন্সিল বানালাম শ্লেটে পাত্র ভাঙা চাড়া কেটে।

আদর্শলিপি বইখানা পেয়ে আমার দারুণ উৎসাহ আর উচ্ছ্বাস। তের বছর বয়সে ঐ ঝকঝকে নতুন বইয়ের মালিক হওয়া আমার জীবনের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। মনে আছে বই পেয়ে মক্তবের সব সহপাঠীদের দেখাতে নিয়ে গিয়েছিলাম বাড়ি বাড়ি গিয়ে। রাতের বেলা বই বুকে চেপে শুয়ে থাকতাম। বর্ষার সময় খুব বিপদে পড়তাম। ভিজে যাবার ভয়ে ঢেকে রাখতাম জামা কাপড়ের নিচে। কাঁথা দিয়ে। বইটা সারাক্ষণ পড়তাম, কোনো নির্দিষ্ট সময় ছিল না। মক্তবে তো বটেই, জমিতে হাল দেবার সময় মাঠেও নিয়ে যেতাম। আত্মীয় বাড়িতে গেলে সঙ্গে থাকত বইটা। কিন্তু সেই আনন্দ প্রায় হারাবার মতো হলো যখন মুন্সি সাহেব বললেন, একখানা বাল্যশিক্ষা কিনতে হবে। শুনে মা বললেন, পয়সা কই বাপজান। তখন আমার ভগ্নিপতি মোল্লা সাহেব দিলেন আরবি কায়দাসহ একটি আমপারা। আমি তখন পড়তে লাগলাম বাল্যশিক্ষা, আমপাড়া আর লিখতে লাগলাম শতকিয়া ও কড়াকিয়া। একই সঙ্গে কষতে লাগলাম যোগ, বিয়োগ, অমিশ্র অঙ্ক। এই আমার শিক্ষার তৃতীয় পর্ব। কিন্তু ১৩২১ সালে মক্তবটি বন্ধ হয়ে গেল।

কেন? শামসুল হক প্রসন্ন তাকালেন। তিনি মুগ্ধ হয়ে শুনছিলেন এতক্ষণ।

আর্থিক সমস্যার জন্য। গ্রামের অনেকেই বিত্তবান হলেও শিক্ষার প্রতি ছিল উদাসীন। মুন্সিকে নিয়মিত বেতন দিতেন না। মনের দুঃখে মুন্সি মক্তব বন্ধ করে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দিলেন। সেই সঙ্গে আমার ক্লাসে বসে লেখাপড়া বন্ধ। তারপর থেকে আজ পর্যন্ত নিজে নিজে পড়াশুনা করে আসছি।

বলেন কি? আর কোনো স্কুলে যান নি?

না। মুন্সি সাহেবের সুবাদে ক্লাস টু পর্যন্ত পড়ার সুযোগ পেয়েছি। যাদের অবস্থা ভালো ছিল তারা বরিশাল গিয়ে পড়েছে।

আপনি কী করলেন তারপর? শামসুল হক সাহেব আরো কৌতূহলী হয়ে উঠেন।

আমি তখন ছবি আঁকার দিকে আর জলের কল তৈরির দিকে মনোযোগ দিলাম। আর ঘুড়ি বানাতে থাকলাম।

জলের কল?

হ্যাঁ জলের কল। বাঁশ দিয়ে তৈরি করে পুকুর পাড়ে বসিয়ে পানি তুলতাম। বরিশাল শহরে গিয়ে দেখেছিলাম রাস্তায় জলের কল থেকে পানি পড়ে। তারই দেখাদেখি আমি বাঁশ দিয়ে তৈরি করি জলের কল। ভেবেছিলাম লোকে কিনবে দেখলাম লোকে পুকুরের পানিই খেতে পছন্দ করে। জলের কল কিনতে চাইল না কেউ, তাই ঘুড়ি বানাতে শুরু করলাম। ঘুড়ি বিক্রি করে কিছু লাভ হতো। মাকে সাহায্যের জন্য দিতাম। জমিতে হাল দেয়ার জন্যও সময় পেতাম অনেক।

ঐভাবেই দিন চলে যেত, যদি না একদিন মোল্লা হামিদ আমার ভগ্নিপতি আমাকে মারধোর করতেন।

মারধোর করলেন কেন? আপনাকে তো মারার কথা নয়। দুষ্ট ছিলেন না।

শুনে অল্প হাসলেন আরজ আলী সাহেব। তারপর বললেন, তাঁর ঐ মারের জন্য আমি খুব কৃতজ্ঞ। ঐ ঘটনা আমার লেখাপড়া শিখে মানুষ হওয়ার জন্য দারুণ জেদ সৃষ্টি করেছিল।

AMARBOI.COM

আরজ আলী বাড়ির পুকুর পাড়ে বসে একবার জলের কল চেপে ধরে পানি বার করছে আর একবার সেটা রেখে কাগজ কেটে ঘুড়ি তৈরি করছে। একপাশে কলাগাছের আর বাঁশের ঝাঁড় হেলে আছে পুকুরের দিকে। দুপুরের সূর্য মাথার উপর। চিল উড়ছে আকাশে। ছায়ায় বসে আরজ আলী, তার চারপাশে কাগজ, ছুঁরি, আঠার বোয়ম ছড়ানো। কয়েক মাস হলো তার মক্তব নেই। বাড়িতে বসে বসে ছবি আঁকে আর ঘুড়ি বানায়, ঘুড়ি বিক্রি করে মাকে পয়সা দেয় নিজেও কিছু রাখে। সেই সময় তার ভগ্নীপতি মোল্লা আবদুল হামিদ তাদের সঙ্গে থাকেন। নিজেদের সামান্য জমিতে চাষবাস করেন, বাকি সময় কাটায় তাবিজ বিক্রি করে। আরজ আলীর ছবি আঁকা আর ঘুড়ি বানানো তাঁর মোটেও পছন্দ হয় না। বাজে কাজে সময় নষ্ট না করে আরজ আলীর সংসারের জন্য কিছু করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। এ কথা দুএকবার বলেছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

একদিন দুপুরে ঘর্মাক্ত দেহে মোল্লা সাহেব জমি চাষ করে বাড়ি ফেরার পথে পুকুর পাড়ে আরজ আলীকে ঘুড়ি বানাতে দেখলেন। তাঁর মেজাজ চড়ে গেল। সামনে এসে আরজ আলীকে চড়-থাপ্পড় মারলেন ক্রুদ্ধ হয়ে। তারপর বাড়িতে গিয়ে ছবি আঁকার খাতা বার করে চুলোর আগুনে দিলেন। ভেঙে ফেললেন জলের কল, আঠার বোয়াম, ঘুড়ি বানাবার কঞ্চি। আরজ আলীর মা কান্না শুনে দৌড়ে গেলেন পুকুর পাড়ে ছেলের কাছে।

আরজ আলী চোখ মুছতে মুছতে মায়ের হাত ধরে বাড়িতে এল। তখুনি তাঁর প্রতিজ্ঞা হলো, মানুষ হওয়ার জন্য 'হয়তো পড়ব নয়তো মরব'। নিজ পায়ে দাঁড়াবার শক্তি সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে সেই দুপুরেই ছেঁড়া লুঙ্গি পড়ে পকেটে চৌদ্দ আনা পয়সা নিয়ে সে বেরিয়ে পড়ল পশ্চিমের পথে, বরিশালের দিকে। সেটা ১৩২৪ সালের চৈত্র মাস। রোদ্রে পুড়ে, ঘামে ভিজে, খালি গায়ে আরজ আলী বরিশাল পৌঁছলো বেলা দুটোয়। পথের পাশে একটা দোকানে কিছু খাবার খেয়ে শরীরের শক্তি ফিরে পেল সে। একজন ভদ্রলোক তার সামনে দিয়ে যাচ্ছেন। তিনি মাঝে মাঝে পেছন ফিরে তাকে দেখেন আবার হাঁটতে থাকেন। এক সময় তিনি দাঁড়িয়ে গিয়ে পেছন ফিরে বললেন, কী খোকা কোথায় যাচ্ছ?

আরজ আলী বলল, কোথাও না।

ভদ্রলোক অবাক হয়ে বললেন, কোথাও না মানে? গন্তব্য ছাড়া কেউ যাত্রা করে নাকি?

আরজ আলী বলল, আমাকে লেখাপড়া শিখতে হবে। লেখাপড়া শেখার উদ্দেশ্যে আমি বাড়ি ছেড়ে এসেছি। শুনে ভদ্রলোক কিছুক্ষণ চিন্তা করলেন। তারপর সহানুভূতির সঙ্গে বললেন, এসো আমার সঙ্গে। এভাবে রাস্তায় বেরিয়ে পড়লে তো লেখাপড়া শেখা যাবে না। আমি তোমাকে পথ বাতলে দেবো।

ভদ্রলোকের বাড়ি বরিশাল শহর থেকে সত্তর মাইল পশ্চিমে কাঁচপুর গ্রামে। তাঁদের বাড়ি "কাজি বাড়ি" নামে প্রসিদ্ধ। তাঁর বাবার নাম মোহাব্বত আলী, তাঁর নাম আহাম্মদ আলী। সেই রাত তাঁদের বাড়িতে কাটালো আরজ আলী। সকালে নাস্তা করার পর আহাম্মদ আলী বললেন, এখান থেকে তিন মাইল পশ্চিমে বানরীপাড়া থানা। সেখান থেকে বেলা দশটায় স্টিমার ছাড়বে স্বরূপকাঠির দিকে। স্বরূপকাঠি পৌঁছে আরজ আলী যদি সামান্য দূরত্বে উত্তরের দিকে যায় তাহলে মাওয়া গ্রামে পৌঁছে যাবে। সেখানে মৌলবী নেছার উদ্দিন সাহেবের বাড়ি। তাঁর সঙ্গে দেখা করলে তিনি পড়াশুনার ব্যবস্থা করে দেবেন। মওলানা সাহেবের প্রতিষ্ঠিত মক্তব আর মাদ্রাসা আছে। তিনি একটা এতিমখানাও দিয়েছেন।

স্বরূপকাঠি থেকে আরজ আলী যখন মাওয়া গ্রামে পৌঁছালো তখন দুপুর পেরিয়ে গিয়েছে। চৈত্রের দিন, ক্ষুধা ও পিপাসায় সে খুবই অবসন্ন হয়ে পড়ল। মওলানা সাহেবের বাড়ি সবাই চেনে, বলতেই তাকে দেখিয়ে দিল। বাড়ির কাছে পৌঁছে সে দেখতে পেল কয়েকটি ছেলে বড় একটা পুকুরে কচুরিপানা পরিষ্কার করছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পরিষ্কার লুঙ্গি, সাদা লম্বা পিরহান পরা, গোল টুপি মাথায় একজন দাঁড়িয়ে। সে বুঝল, তিনিই মৌলানা সাহেব।

কাছে যেতে মৌলানা সাহেব তার দিকে উৎসুক চোখে তাকালেন। তারপর বললেন, কী চাও তুমি, আরজ আলী বলল, আপনার কাছে এসেছি।

কেন? আমার কাছে কেন?

লেখাপড়া শিখতে চাই।

মৌলানা সাহেব তার নাম, ঠিকানা জিজ্ঞাসা করলেন। সব শুনে বললেন, মাদ্রাসা যাও, মাস্টার সাহেবের সঙ্গে দেখা করো। তিনি মাদ্রাসায় ভর্তি করে নেবেন।

তাঁর দিকে কিছুক্ষণ তাকালেন মাস্টার এমদাদ আলী। গেঞ্জি গায়ে দিয়ে বসে বসে তালপাতায় বাতাস দিচ্ছেন। টুপিটা টেবিলের উপর, সেখানে মাটির সরাই আর একটা দাগপড়া গ্লাস। মাছি উড়ছে ভনভন করে।

এমদাদ আলী বললেন, ভর্তি হবা? ভালো কথা। অভিভাবকের অনুমতিপত্র নিয়ে এসেছ?

শুনে ভড়কে গেল আরজ আলী, আমতা আমতা করে বলল, জি-না।

মাস্টার সাহেব বললেন, তাহলে চিঠি লেখো। পয়সা আমার কাছ থেকে নিতে পার। উত্তর এলে ভর্তি করে নিবো। এই বলে তিনি দুআনা পয়সা দিলেন আরজ আলীর হাতে।

আরজ আলী খুব দুশ্চিন্তা আর দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়ে গেল। চিঠি লিখলে হয় উত্তর আসবে নয়তো বাড়ি থেকে পালানোর জন্য শাস্তির ব্যবস্থা হবে। সব ঝামেলার মধ্যে তাঁকে মাস্টার সাহেব ভর্তি করাবেন কি না।

লঙ্গরখানায় খেয়ে রাত কাটালো আরজ আলী। সারা রাত ভাবনা চিন্তার পর সকালে রওনা হলো বাড়ির দিকে। লঙ্গরখানার বাবুর্চি নৌকা দিয়ে যাচ্ছিল ঝালকাঠি। তার সঙ্গে সেখানে পৌঁছে হেঁটেই রওনা হলো সে, কেননা তার পকেটে তখন মাস্টার সাহেবের দেওয়া দুআনা ছাড়া আর কিছু নেই। অভুক্ত অবস্থায় উনিশ মাইল পথ হেঁটে অতিক্রম করল সে। পথে বৃক্ষহীন এক বিশাল মাঠ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে তাঁর মনে হলো এ যাত্রায় বুঝি তাঁর রক্ষা নেই। গরমে, ধুলোয় তাঁর নিঃশ্বাস বন্ধ হবার মতো হলো। দুপুরে এক গ্রামে পৌঁছে কৃষকের বাড়ি থেকে চাল-পানি খেয়ে কিছুক্ষণ বিশ্রাম নিয়ে আবার হাঁটতে শুরু করল সে। যখন লামচরি গ্রামে নিজ বাড়িতে পৌঁছালো তখন সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। তাঁকে দেখে মা কাঁদতে কাঁদতে ছুটে এসে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

আরজ আলী শুনল সে বাড়ি ছেড়ে যাবার পর মা খানা-পানি মুখে দেয়নি। দুলাভাই মোল্লা হামিদকে তিনি দোষারোপ করেছেন আর কান্নাকাটি করেছেন। ভগ্নিপতি থানায় গিয়ে তাঁর নিখোঁজ হওয়ার সংবাদ দিয়ে জিডি করেছেন। আজও সেখানে গিয়েছেন তাঁর খোঁজে। তাঁকে যে শাস্তি দেয়ার জন্য কেউ অপেক্ষায় নেই এটা বুঝতে পেরে আরজ আলী আশ্বস্ত হলো। এর কিছুদিন পর মোল্লা আবদুল হামিদ থানায় পুলিশের চাকরি পেয়ে চলে গেলেন। আরজ আলী স্বাধীন হয়ে নিজ

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ইচ্ছা অনুযায়ী চলাফেরা, কাজকর্ম করতে থাকল। সংসার চালানোর দায়িত্বও চলে এল তাঁর কাছে। তাঁর বয়স তখন সতেরো। একদিন ঘরের মাচায় কিছু খুঁজতে গিয়ে আলীর হাতে ঠেকল একটি কাগজের বস্তা। নামিয়ে নিয়ে ধুলো ঝেড়ে খুলল বস্তা। ভেতরে যা দেখল তাতে তাঁর চোখের পলক পড়ে না। মনি-মুক্তারও অধিক সম্পদ বস্তায়, ভেতরে থেকে বেরিয়ে পড়ে তাঁর চোখ ধাঁধিয়ে দিল। কয়েকটি ক্লাসে পড়ার বই; পুঁথি আর হাতে লেখা খাতা। বইয়ের মধ্যে রয়েছে গণিত পাঠ, ভারতবর্ষের ইতিহাস, সরল বাংলা ব্যাকরণ আর গোপাল ভাঁড় নামে একটি গল্পের বই। পুঁথির মধ্যে রয়েছে সোনাভান, জঙ্গনামা, মোক্তাল হোসেন, গাজী কালু, মালু খাঁ এইসব। হাতে লেখা খাতার মধ্যে তন্ত্র-মন্ত্র আর তাবিজ, কবজের নমুনা।

বুঝলেন হক ভাই, দারুণ আনন্দ হলো দেখে। একসঙ্গে এতগুলো বই হাতের কাছে আর কখনো পাইনি। ঐ বস্তাবন্দি বই আমাকে আবার শিক্ষা জগতে নিয়ে গেল। সব অত্যাচার আর লোভ হিংসা সত্ত্বেও মোল্লা হামিদকে ক্ষমা করে দিলাম। যে কয়েকজন আমাকে শিক্ষত হতে সাহায্য করেছে তাদের মধ্যে মোল্লা হামিদকেও আমি কৃতজ্ঞতার সঙ্গে স্মরণ করছি। শামসুল হক বললেন, কি করলেন ঐ সব বইপত্র দিয়ে? স্কুল ছিল না, মাস্টার পেলেন কোথায়?

শুনে বিনম্র হয়ে হাসলেন আরজ আলী। তারপর বললেন নিজেই মাস্টার, নিজেই ছাত্র। এইগুলো একা পড়ার চেষ্টা করলাম। ভূগোল, ইতিহাস আর ব্যাকরণ মক্তবে কোনোদিন পড়ানো হয়নি। এই প্রথম দেখলাম। ধীরে ধীরে পড়তে থাকলাম। পুঁথি নিয়ে বেশি ঘাঁটাঘাটি করলাম না। প্রতিবেশী আবদুর রহিম ফরাজী ছিলেন ভালো পুঁথি পাঠক। ইতিহাস পড়ে বুঝতে পারলাম, কিন্তু ব্যাকরণ মাথায় গেল না। কিন্তু দেখলাম বার বার পড়তে পড়তে স্পষ্ট হতে থাকল ব্যাকরণের সূত্র। ভূগোল পড়তে গিয়েও একই অভিজ্ঞতা হলো। ভূগোল পড়ার সময় আমার ছবি আঁকার পুরনো অভ্যাসটা মাথা চাড়া দিয়ে উঠল। মানচিত্র আঁকতে শুরু করলাম। মানচিত্র আঁকারও সহজ পথ বের হয়ে গেল আকস্মিকভাবে। একদিন অসাবধানতায় হাতের কুপি পড়ে গেল বইয়ের উপর। দেখলাম কেরোসিন তেল পড়ে নিচের লেখা আর ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তার উপর পেন্সিল দিয়ে অনায়াসে মানচিত্র আর ছবি আঁকা যেতে পারে। পরীক্ষা করে দেখলাম কট তেল বা নারিকেল তেল দিয়েও একই ফল পাওয়া যায়। এরপর থেকে তেল মাখানো কাগজ রোদে শুকিয়ে মানচিত্রের উপর রেখে ছবি আর মানচিত্র আঁকতে শুরু করলাম।

গণিত পাঠ বইটি রপ্ত করতে বেশ কষ্ট হলো। বইটা ষষ্ঠ শ্রেণীর। সৌভাগ্যক্রমে বইটির প্রথম দিকে অঙ্কের প্রত্যেকটি প্রক্রিয়ায় নিয়ম ও উদাহরণ দেওয়া ছিল। তাই দেখে অঙ্ক কষতে লাগলাম। শিক্ষকের আবশ্যকতা হলো না। মিশ্রামিশ্র, চার নিয়ম থেকে শুরু করে ভগ্নাংশ, দশমিক, সমানুপাত, ত্রৈরাশিক, বর্গ ও ঘন যাবতীয় অঙ্ক করে বইখানা শেষ করতে দুবছর লেগে গেল।

দুবছর শামসুল হক অবাক হয়ে বললেন। তারপর থেমে বললেন, এতদিন ধৈর্য রাখলেন কী করে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

জেদ। আমার জেদই নিয়ে এসেছে এতদূর। আরজ আলী হাসলেন মধুর ভঙ্গিতে।

সেতো বুঝতেই পারছি। তার মানে ঐ সব বইপত্র পড়ে ষষ্ঠ শ্রেণীর সিলেবাস শেষ করলেন বলা যায়।

তা বলতে পারেন। আরজ আলীর মুখে স্মিত হাসি।

আলী নুর বললেন, শুনলে বিশ্বাস হবে না, কিন্তু আরজ আলী মাতুব্বর মক্তবে ক্লাস টুর পর কোনো শিক্ষকের কাছে পড়াশুনা করেননি।

হাসনাত হাতের বইটির পাতা উল্টে যেতে যেতে বলল, অবিশ্বাস্য। একজন প্রায় অশিক্ষিত লোক এমন একটা বই লিখতে পারলেন কী করে? নিজে নিজে পড়াশুনা করলেও তার একটা লিমিটেশন আছে।

আলী নুর হেসে বললেন, তাঁর জন্য কোনো লিমিটেশন ছিল না। তিনি যে পদ্ধতিতে নিজে নিজে পড়েছেন সেটা স্কুল কলেজে পড়ার চেয়ে কোনো অংশে কম ছিল না।

তা কেমন? হাসনাত উৎসুক হয়ে তাকায়।

আলী নুর বললেন, এ সবই শামসুল হক সাহেবের কাছে শোনা। তাঁকে আরজ আলী মাতুব্বরই বলেছেন গল্পচ্ছলে।

১৩৩৪ সালে বরিশাল টাউন হাইস্কুলে লামচরি গ্রামের দুটি ছেলে পড়ে, আব্দুল আজিজ মাতুব্বর আর ফজলুর রহমান মৃধা। ষষ্ঠ আর সপ্তম শ্রেণীতে পরীক্ষা শেষ হবার পর তাদের কাছ থেকে বই এনে পড়তে শুরু করল আরজ আলী। দিনে মাঠে কাজ করতে হতো বলে রাতেই তাঁর পড়ার সময়। কাজের ফাঁকে যখন মাঠে ছায়ায় বসে বিশ্রাম নেয় তখন হাতে থাকে বই, খাতা। সাহিত্য, গণিত, ভূগোল, ইতিহাস, বিজ্ঞান, ব্যাকরণ, জ্যামিতি, অঙ্ক ইত্যাদি বিষয় পড়ার জন্য রুটিন তৈরি করে নেয় সে। ইংরেজি নেয়নি সেই রুটিনে কারণ হিসেবে বলেছে, উচ্চারণ বিভ্রাট। সে দেখেছে ইংরেজি উচ্চারণ সাধারণ নিয়ম মতো হয় না। কোন কোন বর্ণ লুপ্ত রেখে উচ্চারণ করতে হয়। শিক্ষক ছাড়া এই কাজটি নিজে নিজে করা যায় না বলে আরজ আলী ইংরেজি পড়ার চেষ্টা করেনি। তবে একজন ইংরেজি বিশেষজ্ঞের পরামর্শে সে রাজভাষা নামে একটি বই সংগ্রহ করে। বইটিতে ইংরেজি শব্দের বঙ্গানুবাদ ও উচ্চারণভঙ্গি বাংলায় লেখা ছিল। রুটিন করে নয় এমনিতেই ইংরেজি পড়তে থাকল সে।

১৩৩৮ সাল থেকে ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পড়া শেষ করে সে ত্রৈমাসিক, ষান্মাসিক আর বার্ষিক পরীক্ষা দিল রুটিনমাফিক। বই দেখে পরীক্ষার আগে নিজেই প্রশ্ন ঠিক করে লিখে নেয়। তারপর বই না দেখে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উত্তর লেখে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

প্রশ্নোত্তর মিলিয়ে দেখে বইয়ের সঙ্গে ঠিক হয়েছে কিনা। নিজেই নম্বর দিয়েছে উত্তরের পাশে, বইয়ের সঙ্গে মিলিয়ে। কোনোটায় পাশ, কোনোটায় খারাপ নম্বর হয়েছে। যে সব প্রশ্নের উত্তর ঠিক হয়নি সে সব পরে বই খুলে ভালো করে পড়ে নিয়েছে।

১৩৪৩ সাল পর্যন্ত এইভাবে দুজনের কাছ থেকে প্রতি ক্লাসের বই ধার করে এনে নিজে নিজে পরীক্ষা দিয়ে এক শ্রেণী থেকে উপরের শ্রেণীতে উঠেছে আরজ আলী। কোনো সার্টিফিকেট অর্জন হয়নি এই শিক্ষায়। কিন্তু জ্ঞান হয়েছে। শিক্ষার প্রতি আগ্রহ বেড়েছে।

হাসনাত বলল, অবিশ্বাস্য! এই করে কোন ক্লাস অবধি পৌঁছতে পারলেন তিনি?

আলী নুর একটু ভাবলেন, যেন কিছু মনে করার চেষ্টা করছেন। তারপর বললেন, বোধকরি আই, এ ক্লাস। ফজলুল রহমান মৃধা বি.এ. পর্যন্ত পড়লেও তার পাঠ্য বইগুলো মাতুব্বরের হস্তগত হয়নি। ১৩৪৩ সালের পর থেকে তিনি পাঠ্যপুস্তক পড়ার সুযোগ হারিয়ে ফেলেন। এইতো তার "ভিখারির আত্মকাহিনী" বইতে লেখা রয়েছে এ কথা।

আলী নুর হাতের পাণ্ডুলিপির পাতা ওল্টাতে থাকেন। তারপর বলেন, ১৩৪৩ সালের পর থেকে তাঁর পড়াশুনা নতুন করে শুরু হয় বরিশালে বিভিন্ন লাইব্রেরিতে গিয়ে বই পড়ে, আর লাইব্রেরি থেকে বই নিয়ে এনে বাড়িতে পড়ে। বি এ ক্লাসের পাঠ্যবই তিনি অবশ্য পড়েছেন অনেক পরে। ১৩৮৩ সালে তাঁর মেজ ছেলে আব্দুল খালেক যখন ঢাকায় টি এ্যান্ড টি কলেজে বি এ পড়ে তখন।

হাসনাত বলল, রীতিমত এক ওডেসী। কিন্তু বিজ্ঞানের প্রতি তাঁর আগ্রহ হলো কবে থেকে?

বরিশালের লাইব্রেরিতে বই পড়তে পড়তে। আলী নুর বললেন।

এত বিষয় থাকতে বিজ্ঞান কেন? বলে হাসনাত হাতে 'সত্যের সন্ধান' বইটির দিতে তাকালো।

হয়তো তিনি বিজ্ঞানমনস্ক, সেই জন্য। আলী নুর উত্তর দিলেন। তারপর যোগ করলেন বিজ্ঞান আর দর্শন দুটোই খুব কাছাকাছি। দুটো বিষয়েই সত্যের সন্ধান রয়েছে।

হাসনাত হাতে 'সত্যের সন্ধান' বইটির পাতা ওল্টাতে লাগল।

তাঁর মনে হলো লেখাপড়া শেখার মতো আরজ আলীর বিজ্ঞান শিক্ষাও একটা জেদের ব্যাপার। যেন তিনি কিছু প্রমাণ করতে চান।

আরজ আলী মাতুব্বরের বয়স যখন বত্রিশ বছর তখন তাঁর মায়ের মৃত্যু ঘটে। যে বিধবা মা দুঃখ কষ্টে, চরম দুর্দশার মধ্যে স্নেহ-মমতায় তাকে মানুষ করেছেন তাঁর মৃত্যুতে সে প্রবলভাবে শোকাভিভূত হলো। সেই শৈশবকাল থেকে যে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাকে পেয়েছিল সংগ্রামী জীবনের উৎসাহদাত্রী হিসেবে তাঁর তিরোধানে নিজেকে বড় নিঃস্ববোধ করল। তিনিই ছিলেন তাঁর কর্মজীবনের উদ্দীপনার উৎস। বড় হবার স্বপ্নও সে দেখেছে স্নেহময়ী জননীর পক্ষপুটেই।

আরজ আলীদের আর্থিক অবস্থা তখন মোটামুটি ভালো। লাকুটিয়ার জমিদার রায় চৌধুরীদের নিলাম করা পাঁচ বিঘা জমি কিস্তি বন্দিতে পরিশোধ করে ছাড়িয়ে নিয়ে এসেছে সে। নতুন জমি কিনেছে অন্যের জমিতে কাজ করে, আর জমি জরিপ করে। মায়ের মৃত্যুতে শোকবিহ্বল আরজ আলী চাইলেন মায়ের স্মৃতিকে ধরে রাখতে একটি ফটোগ্রাফের ভেতর। শহর থেকে ক্যামেরাম্যান ডেকে আনা হলো। পেশাদার আলোকচিত্রী এসে মৃতা মায়ের মুখচ্ছবির ফটো তুলল। লামচরি গ্রামের মানুষ বিশেষ করে প্রবীন ব্যক্তিরা এবং ধর্মীয় নেতারা ছবি তোলার ব্যাপারটি সহজভাবে নিতে পারল না। তাদের বিশ্বাস ফটো তোলা এমনিতেই নিষিদ্ধ। তারপর ছবি তোলা হয়েছে নারীর মৃতদেহের। যারা মৃতদেহের সৎকারে এসেছিল তারা তাদের বিশ্বাস অনুযায়ী গর্হিত কাজটির প্রতিবাদে ভর্ৎসনা করে লাশ ফেলে চলে গেল। হতভম্ব আরজ আলী তাঁর কয়েকজন সঙ্গী নিয়ে মাকে সমাধিস্থ করলো।

শোকবিহ্বল এবং অনুভূতিপ্রবণ আরজ আলীর মনে এই ঘটনা গভীর প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করল। তাঁর মনে জেগে ওঠে তীব্র ক্ষোভ।

সেই সময় আমার মনে ক্ষণে এই প্রশ্ন জেগে উঠল, ছবি তোলা যদি সত্যিই শরিয়ত বিরোধী হয় তাহলে সে দোষ আমার। এই অপরাধে মায়ের শেষকৃত্যাদি শাস্ত্র মতে হলো না কেন? মা কেন পেল শাস্তি? সারা জীবন যে মা ধর্মীয় অনুশাসন কঠোরভবে মেনে চলেছেন তাঁকে কেন এইভাবে সাজা দেওয়া হলো?

এই ঘটনার পর থেকেই আমার চিন্তাচেতনার জগতে এক বিপুল পরিবর্তন আসে। আমার মনে অনেক প্রশ্ন জাগে এবং আমি তার উত্তর খুঁজতে থাকি। বিজ্ঞান চর্চা, বিজ্ঞানের অনুশীলনেই আমি কুসংস্কার অতিক্রম করে আলোকিত পথে যাত্রার সম্ভাবনা দেখতে পাই। বিজ্ঞান চর্চার মাধ্যমেই জ্ঞানের আলোক বিস্তৃত করে মানুষকে যুক্তিবাদী করে তুলতে আমার সামান্য প্রয়াস কাজে লাগাতে মনঃস্থির করি।

লাইব্রেরিতে ছিল উপহার পাওয়া, কিনে আনা, চেয়ে আনা এবং চুরি করে আনা বই। দৈনন্দিন জীবনে অধিক শ্রম দিয়ে বাড়তি উপার্জন করে বই কিনতাম। আঠারো বছর বই কিনে এবং অন্যান্যভাবে বই সংগ্রহ করার ফলে বইয়ের সংখ্যা দাঁড়ালো নয়শ'তে। আলমারি কেনার সামর্থ্য না থাকায় বসবার ঘরে কাঠের তাকে সাজিয়ে রাখা ছিল সেইসব বই। ১৩৪৯ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসে এক ভয়াবহ ঘূর্ণিঝড়ে তাঁর বসবার ঘর উড়ে যায়। একটি বইও অক্ষত থাকেনি সেই ধ্বংসযজ্ঞের পর। পথে-ঘাটে নদীর তীরে দুচারটি ছেঁড়া পাতা খুঁজে পেয়েছিলাম শুধু।

আমার মা মারা যাবার পর মাতৃশোকেও এত প্রবলভাবে কান্না পায়নি আমার। এতকালের সংগৃহীত বইগুলি হারানোর শোক আমার পক্ষে ভোলা প্রায় অসম্ভব হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু আমি আবার বই কিনতে শুরু করি। বিজ্ঞানের বই খুঁজে খুঁজে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আনি। পড়ি আর সেই সঙ্গে কিছু লিখতে শুরু করি। এখন বুঝতে পারছেন নিশ্চয়ই কেন বিজ্ঞান বিষয়ক চর্চা আমাকে আকৃষ্ট করেছে। বিজ্ঞান সত্যের সন্ধানে এক শক্তিশালী হাতিয়ার।

আরজ আলী থামলেন। তাঁর স্বরে কোনো উত্তেজনা ছিল না। খুব শান্ত সমাহিতভাবে তিনি কথাগুলি বললেন।

শামসুল হক বললেন, এই বিজ্ঞান চর্চার পূর্বেই কি আপনাকে কমিউনিস্ট বলে গ্রেফতার করা হয়?

১৯৫০ সালে। বিজ্ঞান চর্চা তখন শুরু করেছি। মনে নানা প্রশ্ন। শামসুল হক বললেন, তখন মুসলিম লীগের শাসনে রক্ষণশীল ধর্মান্ধদের প্রতিপত্তি। অপ্রচলিত কথা শুনলেই পাকিস্তান বিরোধী মনে করত।

না। রাজনীতি বিষয়ে আমার চিন্তা-ভাবনা ছিল না। আমি জীবন, সৃষ্টি রহস্য, মহাবিশ্বের স্বরূপ এইসব জানার জন্য বই-পত্র পড়তাম আর নানা প্রশ্ন তৈরি করে নিয়ে উত্তরের অপেক্ষায় থাকতাম। আলোচনা করতেন সে সব বিষয়? প্রশ্ন করতেন কাউকে? শামসুল হক তাকালেন তাঁর দিকে।

কখনো কখনো, এই যেমন ম্যাজিস্ট্রেট করিম সাহেব। বন্ধুত্ব ছিল বুঝি তার সঙ্গে?

বন্ধুত্ব? না-না, বন্ধুত্ব থাকবে কেন। বাজে পুরুষের সঙ্গে বন্ধুত্ব থাকার কথা না।

AMARBOI.COM

লামচরি গ্রামে ছড়িয়ে পড়ল খবরটা। আরজ আলী মাতুব্বর শহর থেকে বই এনে পড়ছে। দিন রাত কাজের ফাঁকে ফাঁকে বই খুলে বসে আর লম্বা খাতায় এক মনে লেখে।

স্ত্রী বললেন, সারা দিন রক্ত খাটেন, রাতের বেলা জেগে জেগে পড়াশুনা করেন। কষ্ট হয় না?

হারিকেনের আলোয় বইয়ের পাতায় দৃষ্টি রেখে আরজ আলী মাথা নেড়ে বলে, না। কষ্ট হবে কেন? এত আর হাল দেওয়ার মতো কষ্টের না। কিংবা গুনটার চেইন টেনে টেনে রোদে পুড়ে, বৃষ্টিতে ভিজে জমি জরিপ করা না। ধীরে সুস্থে পড়া, বুঝে-সুজে লেখা।

কী হবে এত লেখাপড়া করে এই বয়সে? স্ত্রীর স্বরে মৃদু অনুযোগ।

আরজ আলী ঘুরে বসে। স্ত্রী চৌকিতে বসে পানের খিলি বানাচ্ছে। দেয়ালে তার ছায়া বড় হয়ে কাঁপছে। সে হাসি মুখে বলল, লেখাপড়ার কোনো বয়স নেই। শেষদিন পর্যন্ত মানুষের শেখার থাকে।

কী শেখেন আপনি?

জগৎ সম্বন্ধে, জীবন সম্বন্ধে। সত্য কি, মিথ্যা কি? যে মানুষের মনের ঘুম ভেঙেছে তার কত প্রশ্ন। সেই সব প্রশ্নের জবাব পাওয়া যায় বই-পত্রে। কিছু নিজ চোখে দেখে। নিজের সঙ্গে তর্ক করে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

স্ত্রী চুপ করে থাকেন। তারপর বলেন, পীর সাহেবের মুরিদরা আপনার উপর ক্ষ্যাপা। বই পড়ার জন্য ক্ষ্যাপা হবে কেন? বইপত্র পড়ে তাদের কোনো ক্ষতি করিনি। তাদের বিরুদ্ধে কিছু বলিনি। আরজ আলীর মুখে মৃদু হাসি। তারা কয় আপনি মানুষদের ক্ষেপিয়ে দিচ্ছেন। তাদের আবোল-তাবোল বলে বিগড়ে দিচ্ছেন এমন হতে থাকলে পীর-মুর্শিদ মানবে না কেউ, আচার-অনুষ্ঠান বাদ দেবে। তার স্ত্রী মুখ নিচু করে কথাগুলি বলেন। তারা ভুল বুঝেছে আমাকে। আমি কাউকে বিগড়ে দিতে চাই না। কাউকে ক্ষেপানোও উদ্দেশ্য না। যদি তাই হতো আপনাকে দিয়েই শুরু করতাম। ছেলেমেয়েদের দিয়েই শুরু করতাম।

আমাদের দিয়ে? বুঝতে না পেরে স্ত্রী তাকান তাঁর দিকে।

হ্যাঁ আপনাদের বিশ্বাসেই প্রথম আঘাত দিতাম। বলতাম নামাজ-রোজা বন্ধ করো। তা কি করেছি? করিনি। যাদের উপর আমার জোর খাটে তাদেরকেই যখন বলিনি, অন্যদের বলতে যাবো কেন?

তাহলে তারা ক্ষেপেছে কেন? গ্রামে কথাবার্তা রটায় কেন?

সন্দেহ। কেউ নতুন কিছু করলে তাকে সবাই সন্দেহের চোখে দেখে। আমি কোনো কিছু যুক্তি ছাড়া বিশ্বাস করতে চাই না। অন্ধ বিশ্বাস ফেলে আমি সংস্কারমুক্ত মন নিয়ে জ্ঞান অর্জন করে চলেছি। এতেই সন্দেহ, এতেই লোকের আপত্তি। এও এক ধরনের কুসংস্কার। কোনো প্রশ্ন করতে না দেওয়া, তর্ক এগিয়ে যাওয়া।

তর্ক মানেই ঝগড়া-ফ্যাসাদ। কি দরকার তর্কে গিয়ে? স্ত্রী তাঁর দিকে তাকান। তাঁর হাতে পানের খিলি।

স্ত্রীর সরলতায় হাসে আরজ আলী। বলে, তর্কে তো রকম ফের আছে। হিংসা থেকে, বিদ্বেষ থেকে যে তর্ক সে তো ফ্যাসাদ ডেকে আনেই। রক্তারক্তিও হতে পারে। আর তর্ক যদি হয় কোনো জ্ঞানের বিষয়ে, সত্যের সন্ধানে সেখানে ঝগড়া-ফ্যাসাদ হবে কেন? যুক্তির উপরে কোনো কথা নেই।

কি জানি! আপনারে মাঝে মাঝে বুঝতে পারি না। আপনারে নিয়ে ভয় হয়।

ভয়? ভয় কীসের? আরজ আলী তাকায় স্ত্রীর দিকে।

গ্রামে কত রকমের মানুষ কখন কে কি করে কিছু কি বলা যায়?

না, তা করতে যাবে কেন? আমি কারো ক্ষতি করিনি জীবনে। আমার আব্বা আম্মাও করেননি। আপনারে তো আগেই বলেছি, এই লামচরি গ্রামের পত্তন হয়েছে আমার দাদার হাতেই। জলাভূমি ছিল, গুয়া পাতা, মান্দার কাঁটা, জারমুনী ভরা এই জলা-জঙ্গলে সাপ-খোপ আর শেয়ালের বাস ছিল। আমার দাদাই এখানে বসত গড়ে তুলেছেন জঙ্গল সাফ করে। এখন আমাদের অবস্থা পড়ে গিয়েছে, কিন্তু গ্রামের মানুষ পুরনো কথা কি সবই ভুলে যেতে পারে? নাহ্ আমার কেউ ক্ষতি করবে না। আরজ আলী আবার পড়ায় মনোনিবেশ করে।

কয়েকদিন পর পীর সাহেবের আস্তানা থেকে ডাক এল। কয়েকজন মুরিদ এসেছে তাঁকে নিয়ে যেতে। বাড়িতে তখন তাঁর ছেলেদের কেউ নেই। স্ত্রী ভয়ে ভয়ে বললেন, একা যাবেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ। একা যেতে অসুবিধা নেই।

স্ত্রীর ভয় যায় না। তিনি ঘরের বাইরে দাঁড়ানো লোকগুলির দিকে তাকিয়ে বললেন, ছেলেরা আসুক তাদের কাউকে সঙ্গে নিয়ে যান।

নাহ্। তা ঠিক হবে না। ওরা এসেছে যখন নিয়ে যেতে, যাই ওদের সঙ্গে।

ওদের সঙ্গে কিছু দূর গিয়ে আবার ফিরে এল আরজ আলী। বাড়িতে এসে ঘরের কোণ থেকে চটের বড় থলে ঝুলিয়ে নিল হাতে। পীর সাহেবের মুরিদরা সেদিকে তাকিয়ে ভ্রূ কুঁচকে বলল, কী আছে ওতে? লোহা-লক্করের শব্দ পাওয়া যায় যেন?

অস্ত্র-শস্ত্র নাকি?

আরজ আলী হেসে বলে, অস্ত্র থাকবে কেন? আমার প্রয়োজন কি? এই হাত দিয়ে হাল ধরি, গুনটার চেইন ধরি, বইয়ের পাতা খুলে ধরি। অস্ত্র ধরতে যাবে কেন এই হাত?

এত বই পড়ে কী জানলেন? একজন প্রশ্ন করে।

এই তো জানার শুরু। জ্ঞান সমুদ্র অগাধ, অসীম। যতই পড়ি মনে হয় কিছুই জানা হলো না। আরজ আলীর উত্তর।

তাহলে ওসব বই না পড়াই ভালো। আর একজন মন্তব্য করে।

তা কি করে হয়। এ তৃপ্তি জাগানোই তো বইপত্রের কাজ। কৌতূহলী করে তোলা, আরো জানার জন্য আগ্রহ সৃষ্টি করা।

নিজেই যখন সামাল দিতে পারছেন না এইসব বই পড়ে তখন গ্রামের মানুষদের সঙ্গে এ নিয়ে আলোচনা কেন? একজন বলে।

জ্ঞান সবার জন্য। স্বার্থপরের মতো নিজের কাছে লুকিয়ে রাখতে নেই। আইনস্টাইন এই শতাব্দীর একজন বড় বিজ্ঞানী। তিনি মহাবিশ্বের এক গুরুত্বপূর্ণ সূত্র আবিষ্কার করলেন। সবাইকে বললেন, সবাই এই মহাজগতের রহস্য জানতে পারল। একদিন তাঁর তত্ত্ব ধরে এ্যাটম বোমা হলো। তিনি তাঁর আবিষ্কার নিজের কাছে গোপন করে রাখেননি। মানুষের সম্পদ হয়ে গেল তাঁর আবিষ্কার।

বোমা তৈরি কি ভালো? মানুষ মরে, ধ্বংস হয়। একজন মন্তব্য করে।

বিজ্ঞানকে বোমা চালানোর জন্যও ব্যবহার করা যায়, আবার মানুষের কল্যাণের জন্যও। বিজ্ঞানী শুধু আবিষ্কার করবে বিভিন্ন সূত্র। কোনটায় কি ব্যবহার হবে তা ঠিক করে নেবে সরকার। আণবিক বোমা যেমন হয়, তেমনি আণবিক বিদ্যুতে কলকারখানা চলে, ঘরে ঘরে বাতি জ্বলে।

আপনি সামাজিক, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান নিয়ে প্রশ্ন তোলেন কেন? সবাই যা জন্মগতভাবে বংশ পরম্পরায় বিশ্বাস করে এসেছে সে সব নিয়ে তর্কের সৃষ্টি করেন কেন? একজন সরাসরি তাঁর দিকে তাকিয়ে বলে।

বিশ্বাস ভালো, কিন্তু অন্ধ বিশ্বাস মানুষের চিন্তাশক্তিকে দুর্বল করে দেয়।

প্রশ্ন তুলে, বিশ্লেষণ করে সত্যের কাছে পৌঁছানো যায়। সেই সত্যের উপর ভিত্তি করে যে বিশ্বাস তা অনেক মজবুত। আমি প্রশ্ন তুলি বিশ্বাস নিয়ে না, কুসংস্কার নিয়ে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

পীর সাহেব এবাদতখানায় ছিলেন। বেরিয়ে এসে দহলিজে বসে ডাকলেন আরজ আলীকে। হাসি মুখে বললেন, কি মাতুব্বর তুমি নাকি খুব পড়াশুনা করতিছো আজকাল?

খুব আর কোথায়? অবসর সময়ে যা পারি।

ভালো। খুব ভালো। তা কী করবা এত লেখপড়া করে?

কি আর করবো? মনে আনন্দ পাই বই পড়ে।

বেশ, বেশ। মনের আনন্দ দরকার।

সকালের রোদ ক্রমেই চড়া হচ্ছে। পীর সাহেব কেশে গলা পরিষ্কার করে বললেন, তোমাকে কেন ডেকে পাঠিয়েছি জানো মাতুব্বর?

না। তবে আন্দাজ করেছি।

পীর সাহেব আরজ আলীর হাতের ঝোলার দিকে তাকিয়ে বলেন, তাই তো মনে হচ্ছে। শোনো, আমার জমি ফরায়েজ করতে হবে। তুমি ছাড়া দক্ষ আমিন এ তল্লাটে আর কে আছে! তাই তোমাকে ডাকা। এই যে নাও দলিলপত্তর, জমির ম্যাপ। এখন অঙ্ক কষে ফরায়েজ অনুযায়ী ছেলেমেয়েদের মধ্যে ভাগজোক করে দাও তুমি।

বলে পীর সাহেব স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন। সমবেত মুরিদরা ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে গেল কিছুক্ষণের জন্য। প্রস্তুত ছিল না এমন একটা পরিস্থিতি হতে পারে। তারা মুখ চাওয়াচাওয়ি করল পরস্পরের।

পীর সাহেব বললেন, আরজ আলীকে নাস্তা-পানি খাওয়ানোর ব্যবস্থা করো। তারপর তোমাদের মধ্যে কয়েকজন সঙ্গে যাও। তারপর আরজ আলীর হাতের ঝোলার দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমরা বড় আহাম্মক দেখছি। মাতুব্বর তার মাপজোকের চেইন নিয়ে এসেছে এত বছর পর, তোমরা একটু হাতে নিয়ে সাহায্যও করতে পারোনি?

আরজ আলী বলল, ঠিক আছে। আমার এই বোঝা বয়ে বেড়ানোই কাজ। অভ্যাস হয়ে গিয়েছে।

পীর সাহেব গদিতে হেলান দিয়ে বললেন, হ্যাঁ সংসারে যার যা বোঝা তাকেই বহন করতে হয়। যাও মাতুব্বর, একটু খেয়ে-টেয়ে নাও। তারপর কাজ শুরু করো। একদিনে হবে না। কিন্তু শুরু করো আজ থেকেই।

আরজ আলী ভেতরে গেল। তার ঝোলা থাকল বারান্দায়। কয়েকজন মুরিদ গেল সঙ্গে। বাকি মুরিদরা দাঁড়িয়ে থাকল পীর সাহেবের সামনে। একজন বলল, হুজুর, তাকে যে কিছু বললেন না? একেবারেই ছেড়ে দিলেন।

কেন, যা বলার তাতো বললাম। পীর সাহেব ঘুরে তাকালেন।

তার বেশরিয়তী কাজকর্ম নিয়ে কিছু বললেন না যে।

পীর সাহেব মুরিদদের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, মাতুব্বর অন্যদের চেয়ে ভিন্ন। কিন্তু একটা লোক হুমকি হয়ে উঠতে পারে না। তাকে বরদাস্ত করা যায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিন্তু দিনে দিনে যদি তার দল ভারী হয়? একজন মুরিদ গম্ভীর হয়ে বলে।

হবে না। তোমরা চিন্তা করো না। লোকে শুনবে তার কথা, চমকিত হবে। ঐ পর্যন্তই। সাধারণ মানুষ, যাদের সংখ্যাই বেশি, তার সনাতন বিশ্বাস, ধ্যানধারণা ত্যাগ করবে না। শহরে কিছু কিছু বই পড়ুয়া লোক আছে তারা তাকে নিয়ে নাচানাচি করবে। গ্রামের অর্ধশিক্ষিত, অশিক্ষিত মানুষের কাছে কোনো আবেদন থাকবে না।

কিন্তু সে যে বেয়াদবি করছে তা তাকে বুঝিয়ে দেওয়া দরকার হুজুর। কিছুই বললেন না একেবারে।

বেয়াদবি কোথায় করল! ডেকে পাঠালাম চলে এল। ফরায়েজ করতে বললাম, তাতেও নিষেধ নেই। তারপর একটু থেমে বললেন, আরজ আলী মাতুব্বরের জমি মাপজোক ভুল হয়েছে, বিবাদ সৃষ্টি করেছে শুনেছ কোনোদিন?

মুরিদরা চুপ করে থাকে।

পীর সাহেব বলেন, মাতুব্বরের মাথা খুব পরিষ্কার। অঙ্কের হিসাবে কোনো গরমিল নেই। তার কাজও নিখুঁত, যেখানে চেইন ফেলে টান দেয় তার এক চুল এদিক-সেদিক হয় না। এই তল্লাটে তার কোনো জুড়ি নেই। গ্রামের লোক কি বলে তার সম্বন্ধে শোন নি? তারা বলে 'মাতুব্বর হাত না দিলে একশো খুন বাঁচে না।' যাও এখন। তিলকে তাল করো না। আমি জানি কার সঙ্গে কেমন ব্যবহার করতে হয়।

বিকেলে জমি মাপজোক করে বাড়ি ফিরে আরজ আলী শুনল বরিশাল থেকে লঞ্চ নিয়ে ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব এসেছেন। ঘাটে তার জন্য অপেক্ষা করছেন। ম্যাজিস্ট্রেটের নাম করিম সাহেব।

AMARBOI.COM

ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবকে আমি আগে দেখিনি। কিন্তু নাম শুনেছি। ফজলুল করিম সাহেব। বেশ গোঁড়া আর বদমেজাজি লোক হিসেবে তার খ্যাতি বা অখ্যাতি ছড়িয়ে পড়েছিল। মুসলিম লীগ পন্থী ছিলেন। কথায় কথায় জিন্নাহ সাহেবের বক্তৃতা আওড়াতেন।

লঞ্চের উপর ডেকে তিনি বসেছিলেন। সামনে চায়ের পেয়ালা, পিরিচ। পেছনে পিওন, আরদালী। তিনি আমাকে দেখে কিছুক্ষণ তীক্ষ্ণ চোখে পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর বাজখাঁই গলায় বললেন, মাতুব্বর নাম কে দিয়েছে? মাতুব্বর হলে কি করে? না কি নিজেই জুড়ে দিয়েছ নামের শেষে?

আমাদের পুরুষানুক্রমিক নাম। আরজ আলীর হাসি হাসি মুখ।

মাতব্বর পুরুষানুক্রমিক হতে পারে না। এটা কোনো নাম না, পদবি। যাকে লোকে মাতব্বর বলে, সরকার স্বীকৃতি দেয় শুধু সেইই মাতব্বর। বংশগতভাবে আগে হতো মাতব্বর। এখন স্বাধীন দেশে ঐসব বংশটংশ দিয়ে হবে না। এখন থেকে মাতব্বর নাম ব্যবহার করতে পারবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

মাতব্বর ব্যবহার করি না, মাতুব্বর। আরজ আলী বলে।

ঐ হলো। একই ব্যাপার, গায়ে মানে না আপনি মোড়ল। শুনেছ কথাটি? তাচ্ছিল্যের সঙ্গে তাকালেন করিম ম্যাজিস্ট্রেট।

শুনেছি। হাসিমুখে বলল আরজ আলী।

তাহলে আজ থেকে মাতব্বর আর মাতুব্বর যাই বলো বাদ দেবে নাম থেকে।

সে তো পারব না হুজুর। এ যে আমাদের বংশের পদবি। এমন কোনো আইন আছে যে এই পদবি ব্যবহার করা যাবে না? আরজ আলী খুব শান্ত স্বরে প্রশ্ন করে।

রাগে ফেটে পড়েন ম্যাজিস্ট্রেট সাহেব। চোখ ঘুরিয়ে বলেন, তুমি আমাকে আইনের কথা বলতে চাও? তুমি আইনের কি বোঝ?

সেইটাই বুঝতে চাইছি হুজুর। আমি তো মনে করি না বেআইনি। আপনি বুঝিয়ে দিন তাহলে।

বটে! একজন কৃষকের কাছে আমাকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। তোমার সম্বন্ধে যা শুনেছি দেখছি সবই সত্যি। তুমি অর্বাচীন, উদ্ধত এবং আইন-শৃঙ্খলা ভঙ্গকারী।

আমি কোনো আইন ভঙ্গ করিনি। করলে মাথা পেতে শাস্তি নেবো।

তুমি কি বিজ্ঞান চর্চার নামে নিরীহ সাধারণ মানুষের ধ্যান-ধারণা ভেঙে দিতে চেষ্টা করছ না?

আরজ আলী বলল, আপনি ভুল শুনেছেন। আমি বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ধারণাগুলিকে সত্যের আলোকে দেখতে বলেছি। কতগুলো নীতি, তথ্য বা সংস্কার আছে যা সাধারণ মানুষের বোধগম্য নয়। সে সবের সঙ্গে দর্শন ও বিজ্ঞানের সামঞ্জস্যও নেই। ধর্ম, দর্শন ও বিজ্ঞান এই তিনটি মতবাদের সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে চিন্তা করতে গিয়ে আমার মনে কতগুলো প্রশ্নের উদয় হয়েছে এবং হচ্ছে। আপনি আমার প্রশ্নগুলির সঠিক সমাধানের ইঙ্গিত দিলে খুবই বাধিত হবো।

করিম সাহেব আমার প্রশ্নগুলি কি জানতে চাইলেন। 'সত্যের সন্ধান' বইটিতে আমি যে সব প্রশ্ন উত্থাপন করেছি সে সব তখন পাণ্ডুলিপি আকারে লেখা ছিল। 'সত্যের সন্ধান' বইতে সূচিপত্রে প্রশ্নগুলি যেভাবে লিখিত আছে ঠিক সেইভাবেই তাকে প্রদান করলাম তিনি তা গ্রহণ করলেন এবং সঙ্গে নিয়ে গেলেন। বলে গেলেন, 'কয়েক দিন পর জবাব পাবে।'

কয়েকদিন পর সত্যি জবাব পেলাম। ফৌজদারি মামলার লিখিত ওয়ারেন্টে। আমাকে কমিউনিস্ট বলে গ্রেফতার করে শহরে চালান দেওয়া হলো। লামচরি ছাড়ার আগে আমার মক্তবের সহপাঠি জব্বর, সে তখন বরিশাল পুলিশ অফিসে কেরানির চাকরি করে, তাকে খবর দিলাম। পরে সে আমাকে তার সাধ্য মতো সাহায্য করেছিল।

শামসুল হক সাহেব বললেন, আপনার কমিউনিস্ট হওয়া উচিত ছিল।

আরজ আলী হেসে উত্তর দিলেন, এক জীবনে একজন ব্যক্তি সব কিছু করতে পারে কি?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আপনি ছোট বেলাতেই বাবার জমি হারিয়েছিলেন নিলামে। এখন তো বেশ জমিজমা হয়েছে শুনি। শামসুল হক জিজ্ঞাসু চোখে তাকালেন।

তা হয়েছে। অনেক না, তবে স্বচ্ছলতা এসেছে। সব একদিনে হয়নি। ধীরে ধীরে সম্পত্তি গড়ে তুলেছি।

কীভাবে করলেন? আপনার পড়াশুনার মতো এই ব্যাপারটাও আমাকে কৌতূহলী করেছে। প্রায় কপর্দকশূন্য ভূমিহীন একজন মানুষ কি করে মধ্যবিত্ত কৃষক হয়ে যেতে পারে সেটা একটা জানার বিষয়।

শুনে আরজ আলী মাতুব্বর হাসেন। তারপর বলেন, ছেলেবেলা থেকেই পয়সা রোজগার করতে হয়েছে আমাকে। ঘর থেকে চাল চুরি করে ঘুড়ির কাগজ কিনেছি। এই চুরি করার জন্য মনে কোনো গ্লানি থাকেনি। ছেলেবেলা থেকেই অন্যের জমিতে হাল দিয়ে মজুরি পেয়েছি সে সব মার হাতে তুলে দিয়েছি। পুঁথি লিখে বয়াতী হয়ে গ্রামে গ্রামে ঘুরেও আয় হয়েছে বেশ কিছু দিন।

শুনে শামসুল হক আরো কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। সামনে মুখ বাড়িয়ে বলেন পুঁথি লিখেছেন আপনি? বয়াতী হয়ে গান গেয়েছেন? এ তো দেখছি আরেক কাহিনী। বলেন দেখি সব। নাহ্, আপনাকে পুরো চিনতে অনেক সময় নেবে।

না, না। কী যে বলেন। আমি সামান্য মানুষ, সাধারণ বুদ্ধি রাখি, আপনারা বন্ধু হিসাবে ডাকেন এটাই আমার বড় পাওনা।

বলুন দেখি পুঁথি লেখার ব্যাপারটা। জানেন তো আমি সাহিত্যের অধ্যাপক। ব্যক্তিগত নয় পেশাগত কৌতূহলও আছে। কে বলতে পারে হয়তো আপনাকে নিয়ে একটা গবেষণাও ফেঁদে বসতে পারি। বলে হাসতে থাকেন শামসুল হক।

আরজ আলী স্মৃতিচারণের ভঙ্গিতে বলতে থাকেন, ঐ যে বলেছিলাম একদিন বাড়ির মাচায় মোল্লা আব্দুল খালেদের একটা বইয়ের বস্তা পেয়ে যাই। তখন আমার বয়স সতেরো হবে। সেই বস্তায় ছিল গণিত, ভূগোল, ইতিহাস ও ব্যাকরণ বই। আর ছিল কয়েকটি পুঁথি, সোনাভান, জঙ্গনামা, সাইফুল মুলক বদিউজ্জামান, মোক্তার হোসেন এইসব। প্রথম দুতিন বছর পুঁথি নিয়ে ঘাঁটাঘাটি না করে পাঠ্যপুস্তকের দিকেই মনোযোগ দিলাম। ষষ্ঠ শ্রেণীর পাঠ্যপুস্তক পড়ে শেষ করে, নিজে নিজে পরীক্ষা দিয়ে মোটামুটি সন্তুষ্ট হয়ে পুঁথি পড়া ধরলাম জোরেশোরে। আমার প্রতিবেশী আব্দুর রহিম ফরাজী ছিলেন পুঁথি পাঠক। রাতে তার সঙ্গে সুর করে একসঙ্গে পুঁথি পড়তে লাগলাম, এতে তাঁর সুর অনুকরণ করা সুবিধা হলো। পরে একা একাই পড়তাম। পুঁথি পড়তে পড়তে নানা কেচ্ছা জানা হলো। পুঁথি পয়ার ও ত্রিপদী জাতীয় ছন্দের অনুকরণে কিছু পদ্য লেখার ইচ্ছাও জেগে উঠল।

গ্রামে তখন পুঁথি গানের খুব প্রচলন। পুঁথি পড়া আর হাসি গান করা কিন্তু ভিন্ন। পুঁথিকে অনেকে 'সায়েন গান'ও বলে। কবি গানের মতো। এই গান গাওয়ায় একজন বয়াতী ও দুতিন জন দোহার থাকে। পুঁথিগত কোনো কেচ্ছা কাহিনী কিংবা দেখা বা শোনা কোনো ঘটনাকে কেন্দ্র করে বয়াতী গান রচনা করে থাকে। অনেক

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময় মজলিশের কোন আশু ঘটনাকে কেন্দ্র করেও গান রচনা করে থাকে। পুঁথি গানের দুটি অংশ ধুয়া ও লহর। 'লহর' অংশটা বয়াতী একাই গেয়ে যায়। আর ধুয়া অংশটা দোহাররা পুনরায় গেয়ে শোনায়।

আমাদের গ্রামে পুঁথি গানের বয়াতী ছিলেন মেছের আলী সিকদার। ১৯১৪ সালে প্রথম মহাযুদ্ধে যোগ দিয়ে তিনি বসরায় চলে যান। যুদ্ধশেষে ১৯১৯ সালে তিনি আবার নিজের গ্রামে ফিরে আসেন। তারপর থেকে বিভিন্ন আসরে পুঁথি গান করতে থাকেন। আমি তাঁর আসরে প্রথম যেতাম শ্রোতা হয়ে, পরে দোহার হয়ে বসতাম তাঁর পাশে। এরপর সিকদার সাহেবের গানের অনুকরণে গান রচনার চেষ্টা করলাম আমি। সিকদার সাহেবেরই একজন দোহার ছিলেন আমার প্রতিবেশী, আব্দুর রহিম ফরাজী। আমার লেখা গান তাকে দেখালাম। ধীরে ধীরে গেয়েও শোনালাম। তিনি শুনে বললেন, ভালো হয়েছে। আসরে গাওয়া চলে। আমি তখন আরো গান রচনা করে ফেললাম।

১৩২৭ সালে আমি বয়াতী হয়ে পুঁথি করার দল গঠন করলাম। আমার দোহার ছিল জাহান আলী, হোসেন মল্লিক ও আব্দুর রহিম খান। সবাই গ্রামের পশ্চিম পাড়ার নিবাসী।

পুঁথি গান প্রতিযোগিতামূলক। একাধিক বয়াতী না হলে জমে না। শ্রোতারা শুনে বিচার করেন কোন বয়াতীর গলার স্বর, গানের সুর ও ছন্দ ভালো। কোন বয়াতী অপেক্ষাকৃত অধিক তার্কিক, বাকপটু আর শাস্ত্রজ্ঞ। দেশী বিদেশী অনেক বয়াতীর সঙ্গে আমার প্রতিযোগিতা হতে থাকল। দেখা গেল জয়ী হলে যে পরিমাণ শাস্ত্র জ্ঞান থাকা প্রয়োজন তা আমার নেই। বুঝলাম, আরো পুস্তকাদি পড়া প্রয়োজন।

এই সময় সংসারের ভার এসে পড়ে আমার উপর। মোল্লা সাহেব বাউফল থানায় পুলিশের চাকরি করেন। আমাদের পরিবারভুক্ত হওয়ায় আমাকে টাকা পাঠান। আমি খরচ করি। হাতে নগদ টাকা পেয়ে আমি কিছু অযথা খরচ করি। খালেফ লায়লা, কাছাছুল আম্বিয়া, ফকির বিলাস, হযরতুল ফেকা, তালে নামা, ছয়েত নামা ইত্যাদি পুঁথি এবং রামায়ন, মহাভারত, মনসামঙ্গল, গীতা, রাধা-কৃষ্ণ, বিলাস ইত্যাদি হিন্দু শাস্ত্রের বই কেনা হলো। রায় বাবুদের লামচরি তহশীল কাছারিতে নীলকান্ত মুখার্জী নামে একজন মুহুরি ছিলেন। তিনি হিন্দু শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন তাঁর কাছ থেকে হিন্দু শাস্ত্র সম্বন্ধে অনেক কিছু জানতে পারি। তিনি বৈদিক ও পৌরাণিক কিছু গ্রন্থ আমাকে দান করেন। বাক বেদের কিছু অংশ তিনি বঙ্গানুবাদও করে দেন। চরমোনাই নিবাসী বাবু যামিনীকান্ত বিশ্বাস দান করেন 'মনুসংহিতা' নামক বৈদিক গ্রন্থখানা। এ সময় আমি দিনে মাঠে কাজ করি। রাতে পুঁথিগান করতাম অথবা ঘরে বসে পুঁথি গান লিখতাম। এইভাবে কৃষি ও পুঁথি গান উভয়ের উন্নতি হতে থাকল। কোনো ঘটনা দেখা বা শোনার পর তার উপর তৎক্ষণাৎ রচনার ক্ষমতা হলো আমার।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

১৩২৫ এর অগ্রহায়ণ মাস থেকে সংসারের জমা-খরচের হিসাব রাখা শুরু করি। মোল্লা সাহেব সে হিসাব দেখতেন। তিনি মাঝে মাঝে যখন বাউফলের থানা থেকে ছুটি নিয়ে আসতেন। প্রথম দিকে বই কেনার খরচ দেখলে অসন্তুষ্ট হতেন। পরে আমার দল নিয়ে যখন গ্রামে গ্রামে আসরে গান গেয়ে রোজগার করতে শুরু করলাম তখন সেই আয় থেকেই বই কেনা হয়ে গেল। সেই সঙ্গে বাড়তি আয় থেকে সংসারের কাজেও খরচ করা সম্ভব হলো। পুঁথি গানের টাকা অন্য পুঁজির সঙ্গে মিলিয়ে জমিও কেনা হলো একদিন। এই হলো আমার পুঁথি গান রচনা আর বয়াতী জীবনের কাহিনী।

শামসুল হক বললেন, এখন লেখেন না পুঁথি গান?

নাহ্! গান গাওয়া ছেড়ে দিয়েছি অনেক আগে। একটু মনের দুঃখেই। আরজ আলী মাতুব্বর নিচের দিকে তাকান। যেন সেই দুঃখ এখনো ভারী হয়ে চেপে আছে বুকের উপর।

দুঃখ কেন? কীসের দুঃখ? শামসুল হক আবার কৌতূহলী হয়ে ওঠেন। একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলেন আরজ আলী মাতুব্বর। তারপর বলতে থাকলেন।

১৩৩১ সালে জ্ঞাতিভাই আবদুল রহিম মৃধা বেড়াতে যান তাঁর বেয়াই এমদাদউল্লাহ কাজির বাড়ি কালিগঞ্জে। মৃধা সাহেব ছিলেন ধনে মানে অঞ্চলের সেরা। তিনি তাঁর আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আমাকেও নিমন্ত্রণ করলেন। সঙ্গে আমার গানের দলের দোহারদেরও নিতে বললেন। মৃধা সাহেব কালীগঞ্জে যাচ্ছেন বিয়ের 'পয়গাম' নিয়ে। সুতরাং খুব ধুমধাম হবে। আমাকে গান করতে হবে দলের সঙ্গে। নির্দিষ্ট দিনে কাজি বাড়ি পৌঁছানোর পর বৈঠকখানায় বসলেন মৃধা সাহেব আর তাঁর নিকট আত্মীয়রা। মেঝের মাঝখানে গেদা, বালিশ, তাকিয়া সাজানো। আমাকে বসানো হলো দোহারদের সঙ্গে বাইরের বারান্দায়।

বুঝলাম 'বয়াতী' পরিচয়ের জন্যই এই ব্যবস্থা। যাই হোক, গান করলাম গলা খুলে, খুব উৎসাহ নিয়ে। বুঝতেই দিলাম না মনের জ্বালা। বাড়ির মালিক খুশি হয়ে বখশিস দিলেন দশ টাকা। তখনই প্রতিজ্ঞা করেছিলাম, মৃধা সাহেবের পাশে বসতে হবে। বসেছিলামও শেষ পর্যন্ত। ১৩৩৯ সালে মৃধা সাহেব আর আমি দুজনেই চরবাড়িয়া ইউনিয়নের সদস্য নির্বাচিত হই। অধিকন্তু আমি হই নির্বাচিত সহ-সভাপতি যা মৃধা হতে পারেননি। এরপর ১৩৪৬ সালে তাঁর সামনেই সরকার কর্তৃক মনোনীত হই স্থানীয় ডি. এস. বোর্ডের সদস্য। ১৩৪৮ সালে আমাকে করা হয় চরবাড়িয়া জুট কমিটির সহ-সভাপতি।

এতক্ষণ বলে একটু চুপ করলেন আরজ আলী মাতুব্বর। তারপর স্বগত সংলাপের মতোই বলেন, নাহ্, কারো প্রতি আমার রাগ নেই; বিদ্বেষ নেই। বরং যারা আমার পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছেন, নিন্দা বা অপবাদ দিয়েছেন, অবহেলা করেছেন তাঁদের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। তাদের জন্যই আমি নিজের পায়ে দাঁড়াবার শক্তি খুঁজে পেয়েছি। নাহ্! আমার মনে কোনো রাগ নেই। সবাইকে আমি ক্ষমা করেছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামসুল হক তাকিয়ে থেকে বললেন, অভিমান? অভিমান নিশ্চয়ই আছে। শুনে একটু হাসলেন আরজ আলী মাতুব্বর।

তখন ১৩৩৬ সাল। মোল্লা আবদুল হামিদ আরজ আলীর হাতে এক বান্ডিল কাগজ দিয়ে বললেন, এইগুলি সরিয়া রাখিও।

আরজ আলী ঘরের ভেতরে গিয়ে বান্ডিল খুলে দেখল, ভেতরে রয়েছে বন্দকী জমি ছাড়ানোর কয়েকটি ছেঁড়া দলিল, রশিদ ইত্যাদি। সম্পত্তিবিষয়ক কাগজপত্র। পড়ে সব কিছু বুঝতে পারল না সে। সি. এস. ম্যাপখানা নিয়ে বিশেষ চেষ্টা করল তাঁর ভূগোলের জ্ঞান দিয়ে বুঝতে। ভূগোলের মানচিত্রের মতো না হলেও অঙ্কন পদ্ধতি একই ধরনের মনে হলো তাঁর কাছে। তাঁর আঁকবার ইচ্ছা হলো।

ম্যাপটি ছিল ২০২৯ নং মৌজা, চরবাড়িয়া লামচরির ২ নং সিট। ১৬ ইঞ্চি = ১ মাইল। ম্যাপে তাদের বাড়ি, বাগান, পুকুর, নাল জমি, খাল-নদী-নালা সবই আঁকা। সে তার বাবার নামের খাতায় লেখা দাগ নম্বর ম্যাপে মিলিয়ে তাদের জমি সনাক্ত করতে পারল।

তার মনে পড়ল ভূগোলের মানচিত্রে এক ইঞ্চির সমান ৫০, ৬০ কিংবা ৪০০ মাইল। অর্থাৎ এক ইঞ্চির সমান ১১০ গজ বা ২২০ হাত। অনেক সময় ভূগোলের মানচিত্রের আঁকা বিভিন্ন স্থানের দূরত্ব মেপে দেখার ইচ্ছে হতো তাঁর, কিন্তু তা ছিল বাস্তব দিক দিয়ে অসম্ভব। সে দেখল সি. এস. ম্যাপে তেমন কোনো সুবিধা নেই। এখানে পরিধি বড় নয়। সি. এস. ম্যাপের দুটি স্থানের দূরত্ব মেপে তা সরেজমিনে যাচাই করে দেখার ইচ্ছে হলো তাঁর।

সে দেখল সি. এস. ম্যাপের এক জায়গায় একটা স্কেল আঁকা আছে। সেখানে এক ইঞ্চি পাঁচ ভাগে বিভক্ত। অর্থাৎ প্রত্যেক ভাগের মান ছিল ২২ গজ বা ৪৪ হাত, অতি সাধারণ মূল স্কেল। এতে মাপ দেওয়া সম্ভব নয়। সে তখন এক ইঞ্চিকে চল্লিশ ভাগে বিভক্ত করে পিচবোর্ডের টুকরো দিয়ে একটা স্কেল তৈরি করে ফেলল। এর প্রত্যেক ভাগের মান হলো ৫.৫ হাত। একই সঙ্গে তৈরি করল ৫.৫ হাত দীর্ঘ একটা নল। ডিভাইডার বা কাঁটা তৈরি করল টিন দিয়ে। প্রায় ৫ ইঞ্চি দুটি টিনের টুকরো দিয়ে তাদের একদিক স্থূল, অন্যদিকে সূক্ষ্ম করে কেটে উভয়ের স্থূলাংশ একত্র করে একটা খিল মেরে এঁটে দিল সে। এতে কাজ করার মতো ডিভাইডার তৈরি হলো। এইসব জরিপ সরঞ্জাম আর ম্যাপটি নিয়ে সে একদিন মাঠে নামলো মাপজোক করার জন্য।

আরজ আলী সামনে বসে থাকা শামসুল হকের দিকে তাকালেন। তারপর বলতে থাকলেন, মনে পড়ে তখন মাঘ মাস। বাড়ির পূর্ব পাশের জমিটি মাপতে শুরু করলাম। সি. এস. ম্যাপে আমার এই জমিটার দাগ নং ১৩৩১। জমির একটা আলের উভয় প্রান্তে কাঁটা ধরে, তা স্কেলে ফেলে দেখতে লাগলাম যে ওতে স্কেলের

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কটা পুরো ইঞ্চি বা কটা ভগ্নাংশ পড়ল। তারপর প্রতি ইঞ্চির সমান ২২০ হাত এবং প্রতি এক ভগ্নাংশের ৫.৫ হাত ধরে হিসেব করে বের করতে লাগলাম আলটি লম্বায় কত নল বা হাত হলো। তারপর সরেজমিনে জমি মাপ করলাম। এভাবে জমিটার সব কটি আলই জরিপ করা হলো। কিন্তু ম্যাপের হিসাব ও সরেজমিনের পরিমাণ একরূপ হলো না, কিছু বেশি বা কম দেখা গেল। ভাবলাম আমার হিসাবের ভুল, নচেৎ কাঁটা ধরার দোষ। যা হোক এইভাবে মাঠের কাজের ফাঁকে ফাঁকে আমি জমি জরিপ শিখতে লাগলাম হাতেনাতে। লোকজন সাথে নিয়ে নয়, একা একা।

দক্ষিণ লামচরিতে তোরাপ আলী আকনজী ছিলেন একজন দক্ষ আমিন। আমি আমার জরিপ কাজের ইচ্ছা ও কায়দা তাকে জানালে তিনি বললেন যে হিসেব কষে কষে ওভাবে জরিপ কাজ করা সম্ভব না। ওর জন্য স্বতন্ত্র ব্যবস্থা আছে। সেটেলমেন্টের ম্যাপ দ্বারা দ্বারা 'হাত' এ জরিপ কাজ করতে হলে তার জন্য বিঘা-কাঁটার স্কেল ও শিকল ব্যবহার করতে হয়। তিনি বললেন যে তাঁর একটা বিঘা কাঠার স্কেল আছে যা তিনি এখন ব্যবহার করেন না। কাজেই ওটা দিতে পারেন এবং তাঁর শিকলটাও কিছুদিনের জন্য দিতে পারেন। আমি তার শিকল ও স্কেল নিয়ে এলাম। পরে বরিশাল হতে লোহার মোটা তার কিনে এনে আকনজী সাহেবের শিকল দেখে ও মেপে তার কেটে কেটে বাড়ি ও আংটি বানিয়ে ১/৪ বিঘা অর্থাৎ ২০ হাত দৈর্ঘ্য এক গাছা তৈরি করে আকনজী সাহেবের শিকল ফেরত দিলাম।

স্কেল ও শিকল ব্যবহারের ফলে জরিপ কাজে আমার কিছুটা আত্মবিশ্বাস জন্মালো। অনেক জমি জরিপ করে দেখতে পেলাম যে কোনো জমির ম্যাপের মাপে ও দখলের মাপে যে ব্যতিক্রম দেখা যায় তা অনেক ক্ষেত্রেই দখলের ভুলের জন্য। সে ভুল শোধরানোটাই হলো আমিনের কাজ। আমিন হিসাবে আমার দ্বারা প্রথম জমি জরিপ করালেন আমার প্রতিবেশী ও জ্ঞাতি চাচা মহব্বত আলী মাতুব্বর। জমিটা তাঁর জমির পূর্বপার্শ্বে সি. এম / ম্যাপের ১৩৩৪-১৩৪০ নং দাগ। আমাকে বারবরদারী দিলেন এক টাকা।

এই অঞ্চলের জমি জরিপ কাজের দুটি প্রথা আছে, দেশী ও বিদেশী। দেশী প্রথায় জরিপ হয় হাত বা নলে ও পরিমাপকে বলা হয় বিঘা, কাঠা বা কানি, কড়া ইত্যাদি। বিদেশী (ব্রিটিশ) প্রথায় জমি জরিপ করা হয় লিঙ্ক বা চেইনে। আর পরিমাপকে বলা হয় একর বা শতাংশ। বিদেশী প্রথায় জরিপ কাজে গান্টারের চেইন ও স্কেল ব্যবহার করতে হয়। প্রথমে আমার তা ছিল না। এমনকি জানাও ছিল না। আমি অতি সহজভাবে দেশী প্রথায় জরিপ কাজ শুরু করি। কিন্তু এ প্রথায় নানাবিধ অসুবিধা ভোগ করতে হয়। তাই বিদেশী অন্যান্য আধুনিক জরিপ পদ্ধতি শিক্ষায় উদ্যোগী হই।

১৩৫৩ সালের পৌষ মাসে লাহারজি স্টেটের সার্ভে সুপারভাইজার বাবু বিনয় গোপাল বসু মহাশয় আমাদের গ্রামে পূর্ব পার্শ্বস্থ প্রতাপপুর মৌজা জরিপ করতে আসেন এবং বহুদিন যাবত এখানে জরিপ কাজ করেন। সে সময় আমি তাঁর

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সহকর্মীরূপে কাজ করি এবং জরিপ বিষয়ক নানাবিধ যন্ত্রপাতি যথা নর্থ কম্পাস, প্রিজমেট্রিক কম্পাস, সাইড ভ্যান, রাইট এঙ্গেল ইত্যাদির ব্যবহার পদ্ধতি জেনে নিই।

বরিশালের 'ফরিয়াপট্টি' নিবাসী বাবু ললিত মোহন সাহা ১৩৫৪ সালে আমাকে একটি গান্ডারের চেইন উপহার দেন এবং স্থানীয় কাছেম আলী (পিং করিমদ্দিন) প্রদান করেন প্রতাপপুর মৌজায় পড়ে পাওয়া একটি (পিতলের) গান্ডারের স্কেল। এ সময় হতেই আমি বিদেশীয় প্রথায় জরিপ কাজ শুরু করি। কিন্তু জরিপ কাজের অন্যান্য যন্ত্রপাতির অভাবে সুষ্ঠুভাবে কাজ করতে পারছিলাম না।

১৩৫৫ সালে স্থানীয় আমিন তোরপ আলী তাঁর কর্মজীবনের শেষ মুহূর্তে তাঁর ব্যবহার্য প্লেন টেবিল ও সাইড ভ্যানটি আমাকে দান করে যান। ১৩৫১ সালে দক্ষিণ লামচরি নিবাসী নজর আলী (পিং কছেরদ্দিন) দক্ষিণের চরে পড়ে পাওয়া একটি (নিকেলের) ড্রাইভার প্রদান করেন। জমিদারি উচ্ছেদ হলে ১৩৬৪ সালে লাখুটিয়ার জমিদার মি. নরেন লাল রায়ের (ঘুঘু বাবুর) তৎকালীন ম্যানেজার বাবু অনন্ত কুমার বসু মহাশয় (তাঁদের অনাবশ্যকীয় বিধায়) আমাকে প্রদান করেন একটি নর্থ কম্পাস। একটি প্রিজম্যাট্রিক কম্পাস, চারটি রাইট এ্যাঙ্গেল ও একটি অপটিক্যাল স্কোয়ার। এরপর হতে কোনো যন্ত্রপাতির অভাব না থাকায় আমি সুষ্ঠুভাবে জরিপ কাজ করতে সক্ষম হই।

জরিপের বেশির ভাগ কাজই হল জমি সীমানা নির্ধারণ ও বাটারা করা। কিন্তু আমাকে মানচিত্র অঙ্কনের কাজ করতে হয়েছে যথেষ্ট। এর মধ্যে আমার প্রধান দুটি কাজ ছিল ১৩৬৯ সালে চরবাড়িয়া ইউনিয়নের ম্যাপ অঙ্কন ও ১৩৭৪ সালে চরমোনাই ইউনিয়নের ম্যাপ অঙ্কন করা। এর পারিশ্রমিক প্রাপ্ত হয়েছি যথাক্রমে– ২০০ ও ১৮৭ টাকা।

জরিপ কাজে শুরু হতে আমার বারবরদারী বা ভিজিট ছিল নিম্নরূপ:

১৩৩১ সাল হতে	১৩৪৫ সাল পর্যন্ত	(খোরাকী বাদ) দৈনিক ১.০০ টাকা
১৩৪৬ সাল হতে	১৩৫৩ সাল পর্যন্ত	(খোরাকী বাদ) দৈনিক ২.০০ টাকা
১৩৫৪ সাল হতে	১৩৫৬ সাল পর্যন্ত	(খোরাকী বাদ) দৈনিক ৫.০০ টাকা
১৩৫৬ সাল হতে	১৩৫৭ সাল পর্যন্ত	(খোরাকী বাদ) দৈনিক ৬.০০ টাকা
১৩৫৮ সাল হতে	১৩৭৭ সাল পর্যন্ত	(খোরাকী বাদ) দৈনিক ৮.০০ টাকা
১৩৭৮ সাল হতে	সাল পর্যন্ত	(খোরাকী বাদ) দৈনিক ১০.০০ টাকা
১৩৭৯ সাল হতে	সাল পর্যন্ত	(খোরাকী বাদ) দৈনিক ১৬.০০ টাকা
১৩৮০ সাল হতে	সাল পর্যন্ত	(খোরাকী বাদ) দৈনিক ২০.০০ টাকা
১৩৮১ সাল হতে	সাল পর্যন্ত	(খোরাকী বাদ) দৈনিক ৩০.০০ টাকা

জরিপ শিক্ষাবিষয়ক কোনো বই পুস্তক পাঠের সৌভাগ্য আমার হয়নি। বুঝলেন ভাই, এই জরিপের কাজ করে আমার বেশ কিছু আয় হয়। যা দিয়ে সংসার চালিয়েছি,

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কিছু সঞ্চয় করে ভবিষ্যতে জমি কিনেছি। এইভাবে বয়াতী গান করে, অন্যের মাঠে হাল দিয়ে, আর জরিপের কাজ করে এতদূর এসেছি। এখনো এই বৃদ্ধ বয়সে জরিপের জন্য ডাক পড়লে এগিয়ে যাই। এটাই আমার এখনকার আয়ের পথ।

আমার বয়স যখন ২২ বছর তখন মা প্রায় জোর করেই আমার বিবাহ দেন। লেখাপড়ার জন্য সংসার করার প্রতি আমার খুব আগ্রহ ছিল না। কিন্তু বিবাহের পর আমার প্রথম স্ত্রীকে নিয়ে খুব সুখেই ছিলাম। আমার জ্ঞানচর্চায় তার আপত্তি ছিল না।

আমি ৬০ বছর পর্যন্ত যত আয় করেছি সেই আয় জমি জমা, পুত্র-কন্যাদের দিয়েছি। এখন আমি তাদের পোষ্য। কিন্তু এখনো আমি শারীরিক পরিশ্রম করি। হাল দিতে পারি না, বয়াতী হয়ে গান গাওয়ার ক্ষমতাও নেই, কিন্তু জমি জরিপের কাজ পারি। সেই আয় দিয়ে বেশ জমি কিনেছি। এখন কিছু জমি বিক্রি করে একটি লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করতে চাই।

লাইব্রেরি? কোথায়? হঠাৎ লাইব্রেরির কথা ভাবছেন কেন? শামসুল হক তাকালেন তার দিকে।

আরজ আলী মাতুব্বর বললেন, লামচরি গ্রামে লাইব্রেরি করতে চাই। চুরি করে, ভিক্ষা করে যত বই এনেছি সারাজীবন আর নিজের কেনা বই দিয়ে লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা করতে চাই গ্রামে। লামচরি গ্রামে এখন মক্তব আছে, স্কুল আছে, মসজিদ আছে, কিন্তু লাইব্রেরি নেই।

লাইব্রেরি কেন? অন্য কিছু করতে পারেন। ডিসপেনসারি, মেয়েদের স্কুল। গ্রামের লাইব্রেরি কজনে ব্যবহার করবে?

আরজ আলী অর্ধনির্মিলিত চোখে মুখ উপরে রেখে আস্তে আস্তে বললেন, জ্ঞানার্জনের মাধ্যম স্কুল, কলেজ না; তা হচ্ছে লাইব্রেরি। এই জন্য আমি লাইব্রেরিকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ে অধিক শ্রদ্ধার চোখে দেখি। কৈশোরে ছাত্রদের কাছ থেকে ধার করে এনে বই পড়া যখন বন্ধ হয়ে যায় তারপর থেকে লাইব্রেরিই আমার শিক্ষাঙ্গন। তখন থেকেই আমি লাইব্রেরিকে ভালোবেসে এসেছি। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়েছি লাইব্রেরিতে। লাইব্রেরি আমার তীর্থস্থান। আমার মতো আরো অনেকের জন্য শিক্ষা-পীঠ হতে পারে লাইব্রেরি।

আরজ আলী মাতুব্বর এতক্ষণ আত্মগত হয়ে কথা বলে যাচ্ছিলেন। এখন থামলেন। কিছু যেন চিন্তা করছেন।

কথা হচ্ছিল জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে শামসুল হক সাহেবের ফ্লাটে। চায়ের শূন্য কাপ টেবিলে। মাতুব্বর সাহেব আরাম কেদারায় হেলান দিয়ে বসেন। বাইরে একদল ছেলে স্লোগান দিতে দিতে যাচ্ছে। বাসের হর্ন শোনা যাচ্ছে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

রাস্তায়। একটা চড়ুই উড়ে এসে বসল জানালার দিকে। বিকেলের রোদ ক্রমেই তেজ হারাচ্ছে।

আরজ আলী মাতুব্বর সামনে কিছুটা ঝুঁকে বললেন, লাইব্রেরি ছাড়া আমার আরো একটি তীর্থস্থান আছে গ্রামে। সেটি হলো ৬৭ বছরের পুরনো একটি দোচালা খড়ের ঘর। মুন্সি আব্দুল করিম সাহেবের মক্তব ছিল এই ঘরে। সেটা আমার শৈশব তীর্থস্থান। সেখানে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা ছিল। তাই পুণ্য তীর্থ। তাই নয় কি? বলে তিনি অল্প হেসে শামসুল হকের দিকে তাকালেন। তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন বাইরে স্লোগানের চিৎকার শুনে চুপ করে গেলেন।

শামসুল হক বললেন, জমি বিক্রি করে লাইব্রেরি স্থাপন করবেন শুনে আপনার ছেলেমেয়েরা অসুখী হবে না?

কেন হবে? আমি তো তাদের বঞ্চিত করিনি। তাদের প্রাপ্য বুঝিয়ে দিয়েছি। ষাট বছর পর্যন্ত যা আয় করেছি শুধু সেই আয়ের উপরই তাদের হক। ষাট বছরের পর থেকে যা আয় করেছি সেটা আমার একার, তা দিয়ে আমি জনহিতকর কাজ করলে ছেলেমেয়েদের অসুখী হওয়ার কারণ নেই।

লাইব্রেরির প্রতি আপনার এমন গভীর আকর্ষণ আর শ্রদ্ধা আমার জানা ছিল না। আজ আপনার চরিত্রের আর একটা দিকের কথা জানতে পারলাম।

শুনে আরজ আলী মাতুব্বর অবাক হয়ে বললেন, কেন গোলাম কাদির সাহেব বলেননি আপনাকে? লাইব্রেরির কাছে আমার ঋণ কত গভীর তিনি জানেন। তিনি আমাকে বি.এম. কলেজে লাইব্রেরি থেকে অনেক বই দিয়ে জ্ঞানের ক্ষুধা মিটিয়েছেন। একটু থামলেন তিনি। তারপর বললেন, আমার মতো গ্রামের একজন নগণ্য মানুষের পক্ষে বরিশাল শহরে গিয়ে লাইব্রেরিতে বসে বই পড়া যে কী দুষ্কর ছিল এখন তা ভাবা যায় না। টুপীর ব্যবসায়ী ওয়াজেদ আলী তালুকদার আমাকে প্রথম সাহায্য করেন লাইব্রেরিতে ঢুকতে। তার সাহায্যেই ব্যাপটিস্ট মিশন লাইব্রেরির মরিস সাহেবের সঙ্গে পরিচয় হয় আমার। তিনি আমাকে যে সাহায্য করেছেন তা ভোলা যাবে না। এরপর বলতে হয় বরিশাল পাবলিক লাইব্রেরির এয়াকুব আলী মোক্তার সাহেবের কথা। আমার জ্ঞানার্জনের পথে অধ্যাপক গোলাম কাদির এক মহাশক্তির উৎস। তিনি না হলে লাইব্রেরির বই গ্রামের বাড়িতে এনে পড়ার সুযোগ হতো না আমার। পরবর্তীতে বই দিয়ে পড়াতে সাহায্য করেছেন অধ্যাপক শরফুদ্দিন রেজা হাই, আলী নুর সাহেব আর আপনার কথা সামনাসামনি নাই বা বললাম। এত মূল্যবান বড় বড় লাইব্রেরির দরজা সামনে খুলে গিয়েছিল বলেই আমি যৎকিঞ্চিত পড়াশুনা করতে পেরেছি। জ্ঞানের জন্য আমার পিপাসা জেগেছে।

শামসুল হক বললেন, বুঝতে পেরেছি। লাইব্রেরির সঙ্গে আপনার একটা আবেগের সম্পর্ক রয়েছে। শুধু বুদ্ধিবৃত্তির নয়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আরজ আলী মাতুব্বরের মুখ খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যেন বিকেলের রোদ ছলকে পড়েছে জানালা গড়িয়ে। চড়ুই পাখিটা তখনো ওড়াউড়ি করছে জানালার কাছে। চিরিক চিরিক শব্দ তুলছে থেকে থেকে।

আরজ আলী মাতুব্বর বললেন, আপনারা সবাই আমাকে যে কৃতজ্ঞতাপাশে বেঁধেছেন তার তুলনা নেই। আমার জ্ঞানার্জনের পিপাসা ছিল, আপনারা বইয়ের জগতের দরজা খুলে দিয়ে সেই পিপাসা মিটিয়েছেন।

একটু থামলেন আরজ আলী মাতুব্বর। তারপর মৃদু হেসে বললেন, শুধু কি তাই? যখন গোপনে আমার চিন্তা, ধ্যান, ধারণাকে লিপিবদ্ধ করেছি আপনারাই উৎসাহ দিয়েছেন। রাজশক্তির রক্তচক্ষুকে এড়িয়ে এই গোপন ক্রিয়াকাণ্ডে আপনারা ছিলেন মস্তবড় সহায়।

আপনি বাড়িয়ে বলছেন মাতুব্বর সাহেব। শামসুল হক সোফা থেকে উঠে দাঁড়ান। পর্দার ফাঁক দিয়ে সূর্যের রশ্মি এসে পড়ছিল চোখের উপর। তিনি পর্দাটা টেনে দিলেন। তারপর সোফায় বসতে বসতে বললেন, আপনার জন্মগত প্রতিভাই আপনাকে সাফল্য দিয়েছে। আমরা নিমিত্ত মাত্র।

প্রতিভা স্ফুরণের অনুকূল পরিবেশ প্রয়োজন। এ কথা আপনাকে জোর করে বোঝাতে হবে না। আপনারা আমার মতো নগণ্য অশিক্ষিত গ্রামের কৃষককে জ্ঞানী গুণীদের আসরে নিয়ে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। আমি যা কিছু স্বীকৃতি আর সম্মান পেয়েছি তার পেছনে আপনারা।

শামসুল হক বললেন, আমাদের সৌভাগ্য আপনার মতো ক্ষণজন্মা এক ব্যক্তির সংস্পর্শে আসতে পেরেছি। আপনি আমাদের অহংকার আর আত্মতৃপ্তিকে শক্ত হাতে নাড়িয়ে দিয়েছেন।

আরজ আলী কিছু বললেন না। বসে থাকলেন শান্ত হয়ে। চড়ুইটা জানালার শিকে বসে লেজ দোলাচ্ছে আর ঘুরে ঘুরে তাঁকে দেখছে।

AMARBOI.COM

উনিশ'শ সাতষট্টির অক্টোবর।

কয়েকদিন হলো বরিশালে এসেছেন অধ্যাপক শামসুল হক। সদ্য পদোন্নতি পেয়েছেন লেকচারার থেকে সহকারী অধ্যাপকের পদে। মনে প্রফুল্লতা বসন্ত বাতাসের সঙ্গে পাল্লা দেয়। অধ্যক্ষ বললেন, ফ্যামিলি যে ক'দিন না আসে থাকুন আমার বাসায়। রুম তো খালিই থাকে।

শুনে দর্শনের অধ্যাপক কাজি গোলাম কাদির ডেকে বললেন, মাথা খারাপ। বসের বাড়িতে ওঠা কোনো বুদ্ধিমানের কথা নয়। দোষত্রুটি, বদ-অভ্যাস বস জেনে যাবেন। আসুন আমার বাড়ি। বেশ গল্প করা যাবে।

শেষ পর্যন্ত সহকর্মী হানিফের বাসায় উঠলেন শামসুল হক। তার স্ত্রী তখন কাবুল হয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের পথে। স্টাডি ট্যুরে গিয়েছেন মাসখানেক আগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ফিরে আসতে এখনো দেরি। তারপর ঢাকায় থাকবেন কিছুদিন। সুতরাং একা বাড়ি ভাড়া না করে কারু সঙ্গে থাকাই ভালো।

কলেজের পুরনো বিল্ডিংয়ে ক্লাব। একদিন ডেক চেয়ারে বসে আছেন শামসুল হক। কাজী গোলাম কাদির অন্য এক সহকর্মীর সঙ্গে তাস খেলছেন। এক সময় চোখ তুলে বললেন, যে চেয়ারে বসে আছেন জানেন কারা বসতেন সেখানে?

একটু হকচকিয়ে গেলেন শামসুল হক। যেন কোনো অপরাধ করে ফেলেছেন। তাড়াতাড়ি বললেন, কে?

কাজি গোলাম কাদির হেসে বললেন, কবি জীবনানন্দ দাশ, ধীরেন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি। যিনি ডিএসসি নামেই খ্যাত।

শুনে বেশ সম্ভ্রমের সঙ্গে পুরনো কিন্তু শক্ত চেয়ারটার দিকে তাকালেন শামসুল হক। মনে মনে বললেন, এখানে শ্রদ্ধা ও সম্ভ্রম দেখাবার অনেক কারণ আছে। শুধু যে বিখ্যাত অধ্যাপকরা পড়িয়ে গিয়েছেন তাই নয়। এখনো যারা পড়াচ্ছেন তাঁদের অনেকের জ্ঞান-গরিমা অগাধ। অজ্ঞাত কারণে এইসব প্রবীণ শিক্ষকরা এখনো লেকচারার। অথচ তাঁদের চেয়ে বয়োকনিষ্ঠ হয়েও শামসুল হকের মতো শিক্ষকরা পদোন্নতি পেয়ে এসিস্ট্যান্ট প্রফেসর।

হাসনাতের দিকে তাকালেন শামসুল হক। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক ভবনে কথা হচ্ছে দুজনের। ঘরে আবছা অন্ধকার। ফেব্রুয়ারির আকাশ হঠাৎ মেঘলা। মনে হয় বৃষ্টি হবে। শীত যাই যাই করে যাচ্ছে না। জানালার বাইরে কালচে সবুজ মাঠ আর কালো জলাশয়ে শুধু লতা। বিদেশী অতিথি পাখিরা উড়ে আসছে।

শামসুল হক হাসনাতকে বলছেন, বুঝলেন, বি এম কলেজে এই ধরনের ডাইনোসর অনেক। তাদের সামনে বেশ দ্বিধায় সংকোচে কাটছিল।

একদিন সেই ডেক চেয়ারে বসে মেকিয়াভেলীর প্রিন্স পড়ছেন শামসুল হক। কাজী গোলাম কাদির তাস খেলতে খেলতে উঠে এলেন তার কাছে। এদিক সেদিক তাকিয়ে পকেট থেকে লম্বা করে বাঁধা এক বান্ডিল কাগজ দিলেন তাঁর হাতে ধরিয়ে। খুব আস্তে বললেন, পড়ুন। এখানে কিংবা ইচ্ছ হলে বাসায় গিয়ে।

অবাক হয়ে কিছু বলতে না পেরে সেই বান্ডিল খুলে দেখি ব্যবসায়ীদের লাল খেরো খাতার মতো দেখতে এক বিঘৎ চওড়া, দৈর্ঘ্যে এক হাত। রোল করা ছিল বলে টেনে সোজা করে না ধরলে মুড়িয়ে লম্বা সিলিন্ডারের মতো হয়ে যায়।

কাজী গোলাম কাদির যেতে যেতে বললেন, যদি এখানে পড়েন তো ঐ কোণায় গিয়ে বাতির নিচে পড়ুন। দেখবেন যেন অন্য কেউ না দেখে ফেলে। আমি চা দিতে বলছি। বুঝলেন, কৌতূহলী হয়ে তখন সেই খেরো খাতার মতো পাণ্ডুলিপি খুলে বসলাম কোণায় গিয়ে। পাণ্ডুলিপির উপর লেখা 'কুসংস্কার ও তার স্বরূপ', লেখক আরজ আলী মাতুব্বর। প্রবন্ধের শুরু হয়েছিল এইভাবে পাকিস্তানের মহামান্য প্রেসিডেন্ট ফিল্ড মার্শাল আইয়ুব খান লাহোরে এক সভায় বলেছেন, আমাদের দেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতির পথে বাধা হলো কুসংস্কার। প্রেসিডেন্টের এই বক্তব্য অত্যন্ত

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

সময়োচিত হয়েছে। এর প্রয়োজন ছিল। এখন আসুন দেখি কুসংস্কারের জন্ম কোত্থেকে। কুসংস্কার কি? এর কি কি লক্ষণ। আমাদের চিন্তা-চেতনায়, সাহিত্য-সংস্কৃতিতে এর কি অভিব্যক্তি! পাণ্ডুলিপির উভয় পৃষ্ঠায় সুন্দর করে কালো কালি দিয়ে লেখা। মোট পৃষ্ঠা ৩২। আমি মন্ত্রমুগ্ধের মতো প্রবন্ধটি আবার পড়লাম। ভাষা, বাচনভঙ্গি ও বক্তব্য সব কিছু মিলিয়ে চমৎকৃত করার মতো লেখা। অন্ধকার ঘরে হঠাৎ আলোর ঝলকানি অথবা বন্ধ ঘরে ফুরফুরে বাতাস বইবার মতো অভিজ্ঞতা হলো। পুরো লেখায় লেখক কুসংস্কার আর বিজ্ঞানের তুলনা করে তাদের বৈপরীত্য তুলে ধরেছেন। বুঝলেন হাসনাত সাহেব, এমন লেখা আমি কখনো পড়িনি। প্রগতিবাদী হিসেবে বিখ্যাত বহু লেখাপড়ার আমার গর্ব যেন হঠাৎ অদৃশ্য হলো।

তাস খেলা শেষ করে কাজী গোলাম কাদির আমার কাছে এসে বললেন, পড়া হলো? আমি বললাম, হ্যাঁ। কিন্তু ছদ্মনাম ব্যবহার করলেন কেন?

কাজী সাহেব বললেন, ছদ্মনাম হবে কেন! আসল নামই তো ব্যবহার করা হয়েছে।

আমি বললাম, আপনার কি দুটি নাম? একটি কাজী গোলাম কাদির অন্যটি আরজ আলী মাতুব্বর।

কাজী সাহেব বললেন, না, না। ওটা আমার নাম নয়। লেখকের নামই আরজ আলী মাতুব্বর। আমি নই।

আমি বললাম, তিনি কে? কি করেন?

কাজী সাহেব রহস্যময় হাসি মুখ নিয়ে বললেন, আপনি অনুমান করুন দেখি। আমি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললাম, কমপক্ষে এম.এ. পাস। পেশায় অধ্যাপক। কাজী সাহেব সেই রহস্যময় হাসি নিয়ে বললেন, কোনোটাই না। তিনি ক্লাস টু পর্যন্ত পড়ছেন। পেশায় কৃষক।

ঠাট্টা করছেন। এ হতেই পারে না। একজন অশিক্ষিত ব্যক্তি এমন লেখা লিখতে পারে না। হেঁয়ালি রেখে বলুন তো কে ইনি?

সত্যি কথাই বললাম। আপনার কাছে লুকোবো কেন? আমার মেয়ে আপনার ছাত্রী। তার কাছে শুনেছি আপনি প্রগতিশীল মুক্তবুদ্ধির মানুষ। তাই আপনাকে পড়তে দিলাম। অবশ্য তার আগে আরজ আলী মাতুব্বরের অনুমতি নিয়েছি। তিনি শুধু আমাকেই পড়তে দিয়েছেন।

আমি বললাম, অনুমতি নিতে হবে কেন? এত গোপনীয়তাই বা কীসের জন্য?

কাজী সাহেব বললেন, তার উপর সরকারের নিষেধাজ্ঞা আছে। তিনি যেন তাঁর লেখা অন্যকে পড়তে না দেন। এমন কি সবার সঙ্গে আলোচনা করার ক্ষমতাও তাঁর নেই। এই শর্তে ছাড়া পেয়েছিলেন জেল থেকে।

জেল থেকে? আমি অবাক হয়ে তাকাই।

হ্যাঁ জেলে নিয়েছিল গ্রেফতার করে। কমিউনিস্ট বলে অভিযোগ আনা হয়েছিল। আসলে এই ধরনের মুক্তচিন্তার জন্যই সরকারের রোষানলে পড়েছিলেন।

বন্ড দিয়ে বেরিয়ে এলেন?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হ্যাঁ। কি করবেন! জেলে পঁচে মরবার কোনো মানে হয় না। সেই ১৯৫০ সাল সদ্য পাকিস্তান হয়েছে, তখন এ ধরনের মানুষের খুব বিপদ।

এই লেখা কি জেলে যাবার আগের? আমি বোকার মতো প্রশ্ন করি?

না, না? এত আগের হবে কেমন করে! ১৯৫০ সালে কি আইয়ুব খান প্রেসিডেন্ট ছিলেন?

তার মানে তিনি বন্ডের শর্ত মেনে চলেননি। লিখে যাচ্ছেন এবং পড়তেও দিচ্ছেন?

হ্যাঁ। কিন্তু বেশ গোপনে। শুধু যারা বিশ্বস্ত তাদেরকেই পড়তে দেন।

আপনি তাদের একজন? আমি তাকালাম কাজী সাহেবের দিকে।

সে তো দেখতেই পাচ্ছেন?

শামসুল হক পাণ্ডুলিপি হাতে নিয়ে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকলেন কাজী সাহেবের দিকে। তারপর বললেন, ম্যাট্রিকুলেটও না? ক্লাস টু। বিশ্বাস করা যায় না। এমন জটিল বিষয় কী অদ্ভুত মুন্সিয়ানা দিয়ে লেখা। সরাসরি ধর্ম নিয়ে কিছু বলছেন না অথচ ধর্মকে ঘিরে যত কুসংস্কার সে সবের প্রাঞ্জল আলোচনা। খুবই বিজ্ঞানমনস্ক। খুবই প্রগতিশীল। আপনার সঙ্গে কী করে পরিচয় হলো?

সে এক দারুণ অভিজ্ঞতা। আমি তখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি। ১৯৪৯ সাল। বরিশাল এসেছি। আমার বড় ভায়রা জব্বার মিয়ার বিয়ের অনুষ্ঠানে দেখি, দীর্ঘদেহী, সুঠাম শরীরের এক সুদর্শন বাবুর্চি রান্না করছে। বড় বড় ডেকচিতে মশলা দিচ্ছে হিসেব করে। অন্য সবাই দেখছে খুব সম্ভ্রমের সঙ্গে। তাঁকে দেখে কিন্তু পেশাদার বাবুর্চি মনে হলো না। একটু পরেই সংশয় দূর হলো। তিনি আমার বাবার বন্ধু। নাম আরজ আলী মাতুব্বর, লাসচরি গ্রামেই থাকেন। আব্বা যে ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান তার মধ্যে ঐ গ্রাম। বন্ধুপুত্র জানতে পেরে গামছায় হাত মুছে নিজেই পরিচয় দিলেন লাসচরির কৃষক বলে।

তারপর এই কলেজে এসে যোগ দেবার পর দেখি প্রৌঢ় আরজ আলী প্রায়ই লাইব্রেরিতে এসে ঘোরাঘুরি করেন। একদিন সলজ্জে বলেই ফেললেন, বাংলায় লেখা বিজ্ঞানের বই পড়তে চান। যেহেতু বাইরের মানুষ, তাই সুযোগ পাচ্ছিলেন না। আমি ব্যবস্থা করে দিলাম। আমার নামে বইপত্র ইস্যু করানো হলো। এইভাবে দিনে দিনে পরিচয় গভীর হলো। একদিন হাতে তুলে দিলেন পাণ্ডুলিপি, বিজ্ঞানের উপর, দার্শনিক তত্ত্বের উপর, নানা ধরনের সামাজিক ধর্মীয় কুসংস্কারের উপর সেই সব লেখা। ভাষা প্রাঞ্জল আর বক্তব্য এত জোরালো যে পড়া শুরু করলে শেষ না করে পারা যায় না।

শামসুল হক বললেন, এখন যদিও ১৯৫০ নয়, ১৯৬৭। কিন্তু চিন্তার স্বাধীনতা সেই তিমিরেই রয়ে গিয়েছে।

কাজী সাহেব বললেন, সে আর বলতে! মঠবাড়িয়ার হেডমাস্টার বজলুর রহমানের 'জিজ্ঞাসা' বইটি দেখলেন না বের হতে না হতে নিষিদ্ধ হয়ে গেল। মধ্যযুগের ইনকুজিশনকে হার মানাবার মতো।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ভাইস চ্যান্সেলর লোক পাঠিয়েছেন। হাসনাত তাকে বলল, শামসুল হক সাহেবের সঙ্গে কথা শেষ করে নিই। তারপর আসছি।

শামসুল হক ঘড়ির দিকে তাকালেন। তিনটা বাজে। কথা শুরু হয়েছে একটায়। তিনি বললেন, এ তো একদিনে বলা শেষ হবে না। আপনি বাসায় আসুন, অথবা আমি আপনার বাসায় যাই।

হাসনাত বলল, হবে। আজ যতটুকু পারি কথা হয়ে যাক। বলতে বলতে সে সাদা কাগজে নোট লেখে।

শামসুল হক বলেন, আপনি আমার খোঁজ পেলেন কার কাছ থেকে?

হাসনাত বলল, আলী নূর। আমি তার সঙ্গে গ্যালিলিও নাটক দেখতে গিয়েছিলাম। তারপর থেকে আরজ আলী মাতুব্বর সম্পর্কে কৌতূহল। সেই কৌতূহল মেটাতে তাকে যারা চিনতেন তাদের খুঁজে বেড়াচ্ছি।

শামসুল হক বললেন, হ্যাঁ নুর সাহেবের সঙ্গে আমিই পরিচয় করিয়ে দিয়েছিলাম আরজ আলী মাতুব্বরের। বরিশালে আমেরিকান লাইব্রেরিতে দেখা হতো। বেশ চটপটে লোক। সহজেই আপন করে নিতে পারেন। বই পড়ার প্রতি দারুণ ঝোঁক। চমৎকার লাইব্রেরি ছিল বাড়িতে। তাঁর স্ত্রী কলেজে আমার ছাত্রী হবার পর আমি আরো ঘনিষ্ঠ হয়েছিলাম। তাঁকে একদিন পড়তে দিলাম আরজ আলীর লেখা 'সত্যের সন্ধান'। নুর সাহেবের তখন জলবসন্ত। পরদিন তার স্ত্রী সাজু কলেজে এসে আমাকে বলে, কী পড়তে দিয়েছেন ওকে? অসুস্থ শরীরে কাল সারারাত বিছানায় শুয়ে পড়েছে। একটুও ঘুমোয়নি।

আমি মিথ্যে করে বললাম, এই সময়ের একটা লেখা।

সেইদিনই নুর সাহেব ডেকে পাঠালেন। মহাউৎসাহে বললেন, কোথায় এই লেখক! নিয়ে চলেন তাঁর কাছে। তাঁর সঙ্গে পরিচিত হতে চাই। আমাকে পাগল করে ছেড়েছে তাঁর লেখা।

আমি হেসে বললাম, এখনো জলবসন্ত শুকোয়নি। ছোঁয়াচে রোগ। যাবেন কি করে? অপেক্ষা করুন কটা দিন।

নূর সাহেব খুবই রসিক ব্যক্তি। হেসে বললেন, এর চেয়েও সংক্রামক আরজ আলী মাতুব্বরের লেখা। পড়ার পর থেকে অস্থির হয়ে আছি। মানুষটা কেমন দেখতে চাই।

দেখতে খুবই সুপুরুষ। এখন প্রৌঢ় কিন্তু সুস্বাস্থ্যের অধিকারী। দেখলে অবশ্যই চমৎকৃত হবেন।

কী করেন তিনি? নুর সাহেব তাকালেন আমার দিকে।

আমি বললাম, অবিশ্বাস্য ব্যাপার। জানি, বিশ্বাস করতে চাইবেন না। তবু বলছি।

বললাম তাকে সব। নুর সাহেব শুনে তড়াক করে উঠে বসলেন বিছানায়। গায়ের চাদর পড়ে গেল মেঝেতে। চোখে মুখে উগ্র কৌতূহল। উত্তেজিত হয়ে বললেন, এই সময়ে আমার এই অসুখটা হলো?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি সান্ত্বনা দিয়ে বললাম, কটা দিন অপেক্ষা করুন। তিনি বরিশাল আর লামচরি করেন। প্রায় প্রতিদিনই হেঁটে আসেন নয় কিলোমিটার পথ। দেখার ব্যবস্থা করা যাবে।

একদিন কলেজের স্টাফরুমে গিয়েছেন শামসুল হক। দেখলেন পাশাপাশি ডেক চেয়ারে বসে আছেন কাজী কাদির সাহেব আর একজন প্রৌঢ়। তাঁকে আগে কোনো দিন দেখেননি। তিনি দীর্ঘদেহী, সুশ্রী চেহারা, থুতনীর নিচে একগুচ্ছ সাদা দাড়ি, লুঙ্গি আর পাঞ্জাবি পরা। সবচেয়ে আকর্ষণীয় তার দুটি চোখ। খুবই উজ্জ্বল আর একই সঙ্গে সমুদ্রের গভীরতা। ছবিতে রবীন্দ্রনাথ, নজরুল আর বিবেকানন্দের চোখ যেমন অন্তর্ভেদী দেখেছেন তেমনি এই প্রৌঢ়ের চোখ।

শামসুল হক সামনে দাঁড়িয়ে বললেন, আপনি নিশ্চয়ই আরজ আলী মাতুব্বর?

প্রৌঢ় ডেক চেয়ার থেকে সসম্ভ্রমে উঠে দাঁড়ালেন। হাসি মুখে নম্র সুরে বললেন, হ্যাঁ। আপনি?

কাজী সাহেব পরিচয় করিয়ে দিলেন। তারপর বললেন, আপনার লেখা আমি ছাড়া একমাত্র একে পড়তে দিয়েছি। এখন আপনারা আলাপ করুন। আমি চললাম।

বাসায় নিয়ে গেলেন শামসুল হক। আরজ আলী জানালেন, তিনি মাছ মাংস খান না, কেবল শাকসব্জি।

শামসুল হক বললেন, তাই দেওয়া হবে।

আরজ আলী বললেন, রান্না হয়ে গিয়েছে? না হলে শাকসব্জি কেটে দিতে বলুন। আমি রান্না করি।

শামসুল হক অবাক হয়ে বললেন, আপনি রান্না করবেন? আরজ আলী হেসে বললেন আমি প্রায় সবকিছুই করি। জুতা সেলাই থেকে চণ্ডিপাঠ।

সেদিন আরজ আলী যে ভেজিটেবল রান্না করলেন তার স্বাদ তিনি ভুলতে পারবেন না। মশলার পরিমাণ নির্ধারণে তাঁর জুড়ি ছিল না। বিয়ে বাড়িতে তাই তাঁর ডাক পড়ত।

খেতে বসে শামসুল হক আরজ আলীকে প্রশ্ন করলেন, আপনি লেখার জন্য এইসব বিষয় বেছে নিয়েছেন কেন? বিজ্ঞান, সংস্কার, কুসংস্কার এইসব তত্ত্ব কথা? আপনার জন্য স্বাভাবিক হতো বামপন্থী সাহিত্য। জমিদারদের অত্যাচার দেখেছেন, পাকিস্তান রাষ্ট্রের সামাজিক বৈষম্য আর নতুন দিনের শোষণ-শাসন দেখছেন। এসব রেখে বিজ্ঞানভিত্তিক লেখায় ঢুকলেন কেন?

আরজ আলী মৃদু হাসলেন। তারপর শান্তস্বরে বললেন, কুসংস্কার উন্নতির পথে অন্তরায়। কুসংস্কার মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করে তুলতে পারে। আমার জীবনে একটি ঘটনা আমাকে এই সত্য চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

ভাইস চ্যান্সেলরের সঙ্গে কথা শেষ করে হাসনাত অধ্যাপক শামসুল হকের বাড়ি খুঁজে বার করল। তিনি বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। হাত নাড়তেই চেনা গেল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসনাত সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে বলল, আবার শোনা যাক। আশা করি এর মধ্যে খেয়ে নিয়েছেন।

তার বসবার ঘরে দেয়ালে শেক্সপিয়র আর রবীন্দ্রনাথের বাঁধানো ছবি। এক কোণে সোনালি রঙের শৃঙ্খলিত একটি রমণীর ভাস্কর্য। তাকাতে দেখে শামসুল হক বললেন, আমার মেয়ের শখ। মাটি দিয়ে তৈরি করেছে। ঐ যে আরো আছে।

হাসনাত দেখে নিয়ে বলল, খুব সুন্দর এবং আধুনিক। এখন বলুন আরজ আলী মাতুব্বরের কথা। অমার হাতে খুব বেশি সময় নেই।

শামসুল হক বললেন, বিশাল ক্যানভাসের মতো তার জীবন। তাড়াতাড়িতে কতটুকু, শুনবেন?

হাসনাত বলল, আবার আসব। আর হ্যাঁ, তার বইগুলি আমাকে দিন। 'সত্যের সন্ধান' আর 'সৃষ্টি-রহস্য' বই দুটি পাইনি। আলী নুর সাহেব 'মুক্তমন' আর 'অনুমান' বই দুটি দিয়েছেন। বাকিগুলি পাচ্ছেন না এখন।

শামসুল হক হঠাৎ সচেতন ও সতর্ক হয়ে গেলেন। হেসে কিন্তু খুব সাবধানের সঙ্গে বললেন, দিতে পারি, কিন্তু ফেরত দিতে হবে। আর অন্য কাউকে দিতে পারবেন না।

হাসনাত বলল, সব বইয়ের পোকাই এই কথা বলে। ঘাবড়াবেন না। ঠিক পেয়ে যাবেন।

শামসুল হক বললেন, বইয়ের পোকা আমি ঠিকই। কিন্তু শুধু সেই জন্য না। এই বইগুলোর সঙ্গে আমার দীর্ঘ দিনের সাহচর্যের স্মৃতি জড়িত। এক একটা বই প্রকাশ এক একটা ইতিহাস। রীতিমতো রোমাঞ্চকর।

হাসনাত বলল, নুর সাহেব বলেছেন, আপনি, কাজী গোলাম কাদির, শরফুদ্দিন রেজা হাই আর বর্ণমিছিলের আবুল ইসলাম না থাকলে তাঁর 'সত্যের সন্ধান' বইটি দিনের আলো দেখতে পেত না। প্রথমটি প্রকাশিত না হলে পরেরগুলোও বেরুতো কিনা সন্দেহ!

কি হতো তা এখন ঠিক করে বলা কঠিন। তবে এটা ঠিক বিধি-নিষেধ আর হুমকির সামনে তার বই প্রকাশ করা ছিল এক কঠিন ব্যাপার। আমরা যাই করে থাকি না কেন, তাঁর নিষ্ঠার জোরেই বই লেখা হয়েছে। ছাপাও হয়েছে। কৃতিত্ব আরজ আলী মাতুব্বরেরই।

হাসনাতকে নিয়ে তাঁকে স্টাডি রুমে যেতে যেতে কথাগুলি বললেন শামসুল হক।

গ্যালিলিও মঞ্চে দাঁড়িয়ে দূরবীণ নাড়াচাড়া করছেন। কিছু পর একটি কাঠের বল আর খোদাই করা রেল হাতে তুলে নিলেন। পাশের ঘরে এক সন্ন্যাসী তাঁকে পাহারা দিচ্ছে। কন্যা ভার্জিনিয়া দুটি হাঁস নিয়ে ঘরে ঢুকে বলল, একজন কৃষক পাঠিয়েছে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্যালিলিও বললেন, বুঝেছ। এ আমার অনুরাগী আন্দ্রিয়ার কাজ। এটা একটা সংকেত। সে আসবে। আমি যেন প্রস্তুত থাকি।

ভার্জিনিয়া বলল, কীসের জন্য প্রস্তুত?

গ্যালিলিও বললেন, এই তোমার দোষ। সব কিছু জানতে চাও। সময়ে সবই জানবে।

প্রহরী সন্ন্যাসী কাছে এসে বলল, কী কথা হচ্ছে?

ভার্জিনিয়া বলল, কিছু না। পিতার দৃষ্টিশক্তি আরো ক্ষীণ হয়ে আসছে। ডাক্তার ডাকা প্রয়োজন।

সন্ন্যাসী বলল কেন, তিনি আবার লিখছেন টিকছেন নাকি? খুবই ধূর্ত তোমার পিতা।

নাহ্! লিখতে পারছেন কোথায়? যা লিখেছেন সবই তো আপনাদের হস্তগত, ছাপার অনুমতি নেই শুধু লিখে কি হবে?

সন্ন্যাসী তীক্ষ্ণ চোখে দেখে নিয়ে বলে, তার শাস্তি, এই ঘরেই তিনি আজীবন থাকবেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করতে পারেন। কিন্তু তার প্রচার করা যাবে না।

ভার্জিনিয়া বলে, পিতার অনুতাপ নিখাদ। তিনি যে শর্ত মেনে নিয়েছিলেন তা ভঙ্গ করেন না।

এই সময় আন্দ্রিয়া ঘরে ঢোকে।

সন্ন্যাসী বলে, কে এই ব্যক্তি?

ভার্জিনিয়া বলে, পিতার প্রাক্তন ছাত্র। এখন অবশ্য আসা-যাওয়া নেই। অনুতাপ প্রকাশ করে তার আবিষ্কার প্রচারে বিরত থাকবেন এই শর্তে মুক্তি পাবার পর থেকে অন্যান্য প্রাক্তন ছাত্রদের মতো আন্দ্রিয়াও তাঁকে আর সম্মান করে না।

ও। সন্দেহপ্রবণ হলেও আন্দ্রিয়ার দিকে তাকিয়ে সন্ন্যাসী চলে যায়।

আন্দ্রিয়া গ্যালিলিওকে বলে, আমি ইতালি ছেড়ে চলে যাচ্ছি। হল্যান্ডে বিজ্ঞানীরা আপনার কথা শুনতে চাইলে কী বলব?

বলবে, ভাল আছি। ইনকিউজিটরদের শর্ত মেনে চলে, ঘরে বসে বিজ্ঞান চর্চা করে যেতে পারছি। কিন্তু কর্তৃপক্ষ সন্তুষ্ট যে আমি কোনো কিছু প্রচার করছি না এবং নতুন কিছু আবিষ্কারও করিনি।

দুঃখের বিষয় বিদেশেও আপনার আত্মসমর্পণের কথা শুনে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে হতাশা নেমে এসেছে। দেকার্তে তাঁর গবেষণাপত্র ড্রয়ারে বন্ধ করে রেখে দিয়েছেন।

গ্যালিলিও স্বর নিচু করে বললেন, আমি আবার লিখছি। 'ডিসকোর্সি' লিখে পেশ করেছি।

আন্দ্রিয়া আনন্দে লাফিয়ে ওঠে। গ্যালিলিও মুখে আঙুল দিয়ে ফিসফিস করে বলেন, চুপ। সন্ন্যাসী পাহারা দিচ্ছে। শুনে ফেলবে। তুমি এসে ভালোই করেছ।

পাণ্ডুলিপি নিয়ে যাও।

ব্যস্ত আন্দ্রিয়া বলে, কোথায় 'ডিসকোর্সি'? আমস্টারডাম, প্রাগ, লন্ডনে সাড়া পড়ে যাবে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

গ্যালিলিও প্রশান্ত মুখে বললেন, ঐ গ্লোবের ভেতর।

আন্দ্রিয়া দৌড়ে গিয়ে ভূ-গোলকের ভেতর থেকে পাণ্ডুলিপি নিয়ে উল্টে-পাল্টে দেখে। তারপর বলে, আমরা এত দিন ভেবেছি আপনি বিজ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছেন। সত্যকে অস্বীকার করেছেন।

গ্যালিলিও বললেন, তাই তো করেছি আন্দ্রিয়া। অন্তত সবাই তাই জানে।

না, আপনি শত্রুর হাত থেকে সত্যকে গোপন করেছেন। আমরা তখন না জেনে বলেছি আপনার হাত কলঙ্কিত, মলিন। আপনি বলেছিলেন, কলঙ্কিত কিন্তু শূন্য নয়। তখন বুঝিনি এখন পারছি। আপনার হাত অলস হয়ে থাকেনি। এটাই বিজ্ঞানের জয়।

আসি। 'ডিসকোর্সি' এখন সমস্ত মানব জাতির।

গ্যালিলিও আসনে বসতে বসতে বললেন, তাই হোক।

প্রেক্ষাগৃহে আলো নিভে আসে। তারপর আলো জ্বলে উঠলে অভিনেতা/ অভিনেত্রীরা এসে দর্শকদের শুভেচ্ছা গ্রহণ করে। আলী যাকেরের মুখে ঘাম আর তৃপ্তির হাসি।

প্রেক্ষাগৃহের আসন শূন্য হতে থাকে। আলী নুর আর হাসনাত পাশাপাশি বসেন। এক সময় আলী নুর বলেন, আরজ আলী মাতুব্বর গ্যালিলিওর মতো কেউ নন। কিন্তু সত্য সন্ধানী হিসেবে তাকেও একইভাবে কর্তৃপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করতে হয়েছিল। হাসনাত বলল, আপনি কি তাঁর জেল থেকে বন্ড দিয়ে বেরিয়ে আসার কথা বলছেন?

হ্যাঁ। কিন্তু গ্যালিলিওর মতোই তিনি তাঁর প্রতিশ্রুতি রাখেননি, বন্ডের শর্ত ভঙ্গ করেছেন। বই পড়েছেন নেশাগ্রস্তের মতো পাতার পর পাতা লিখেছেন। পাণ্ডুলিপি জমে উঠেছে। পড়তে দিয়েছে খুব ঘনিষ্ঠ মানুষদের। বই প্রকাশ করতে তাকে বাংলাদেশের স্বাধীনতা পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছে। একটু থামলেন আলী নূর। শূন্য মঞ্চের দিকে তাকালেন। তারপর বললেন, অবশ্য বাংলাদেশ হবার পরও বই ছাপাতে গিয়ে তীব্র বিরোধিতার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে। অধ্যাপক শামসুল হক সে সম্বন্ধে আপনাকে বেশ তথ্য দিতে পারবেন। গ্যালিলিওর যেমন ছিল আন্দ্রিয়া, আরজ আলী মাতুব্বরের ছাপার ব্যাপারে অধ্যাপক শামসুল হকের ভূমিকাও ছিল তাই।

অধ্যাপক শামসুল হক বললেন, বাংলাদেশ হবার পর আমরা ভাবলাম এখন তো আর পাকিস্তান আমলের সংকীর্ণতা নেই। সেন্সরশীপ নেই। স্বাধীন দেশে মুক্তচিন্তার পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছে। আরজ আলী মাতুব্বরকে বললাম, এবার বই ছাপতে হয় 'সত্যের সন্ধান' বইটির পাণ্ডুলিপিখানা আমাকে এনে দিন।

সেটা ১৯৭৩ সাল। মাতুব্বরের বয়স তখন ৭৫ বছর। নিয়মিত পড়াশুনা তিনি শুরু করেন ৬০ বছরের পর যখন অবসর নিয়ে দিন কাটানোর সময়। প্রমথ চৌধুরী যে বলেছিলেন, সুশিক্ষিত মানুষ মানেই স্বশিক্ষিত; আরজ আলী ছিলেন তা-ই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসনাত বলল, 'সত্যের সন্ধান' প্রকাশনায় আপনার বেশ বড় ভূমিকা ছিল বলে শুনেছি।

শামসুল হক বললেন, নাহ্। খুব বড় ভূমিকা কোথায়। বড় ভূমিকা লেখকেরই। কিন্তু অনেকেই জড়িয়ে পড়েছিলেন। প্রায় একটি মামলার মতো। শুনুন তাহলে। লেখকের নিজের জবানীতেই শুনুন। 'মুক্তমন' বইটিতে আরজ আলী মাতুব্বর নিজেই প্রকাশনার ইতিহাস লিখেছেন।

হাসনাত 'মুক্তমনের' ভূমিকা পড়তে থাকল।

"বইখানা প্রকাশের জন্য প্রকাশক খোঁজ করলাম– প্রথমত বরিশালে ও পরে ঢাকায়। কিন্তু কোথাও প্রকাশক পাওয়া গেল না। বইখানা পুরাতন শাস্ত্রীয় মতবাদের পরিপন্থী বলে। অগত্যা নিজেকেই প্রকাশক হতে হলো। অর্থের সংস্থাপন করতে হলো কিছু ভূসম্পত্তি বিক্রি ও বন্ধুদের কাছে ধার করে।"

"বইখানা ছাপাতে দেওয়া হলো বরিশালের আল আমিন প্রেসে। ছাপাও হয়ে যাচ্ছে ২০ নং ফর্মা। বাকি মাত্র ভূমিকা। সূচিপত্রাদি ও বইয়ের বহিরাঙ্গসমূহ। এখানেই হলো বাধার সূত্রপাত। ১৬ই শ্রাবণ, ১৩৮০। প্রেসে বসে ২০ নং ফর্মার প্রুফ দেখার সময় দুজন মুছুল্লি এলেন প্রেসে। তাদের না কি একখানা বাংলা কেতাব ছাপা হচ্ছে এ প্রেসে। তারা উভয়ে বহু দিন থেকে আমাকে একজন আমিন (সার্ভেয়ার) রূপে চেনেন। তাদের একজন আমার হাত থেকে পাণ্ডুলিপির কিছু অংশ পড়ে আমাকে বললেন, মাতুব্বর সাহেব, আপনার গায়ের ওজনের সাত-আট গুণ বেশি ওজনের কেতাব আমি পড়েছি। কিন্তু আমি তো কোন লেখালেখি করি না। আর আপনি কিইবা জানেন, তা নিয়ে আবার বই লিখে ছাপাচ্ছেন। এ সব বাজে কাজে সময় নষ্ট না করে আপনার পক্ষে ছিকল নিয়ে মাঠে থাকাই ভালো। বাহুল্যবোধে আমি এই বিদ্রূপাত্মক হিতোপদেশটির প্রতিবাদে বিরত থাকলাম। মাত্র এটুকুই বললাম, হুজুর কাগজের ওজনে বই কেতাবের মূল্যায়ন হয় না। হলে নোবেল পুরস্কার রবীন্দ্রনাথের গীতাঞ্জলী পেতো না। পেতো পি এম বাগচির ডাইরেক্টরী পঞ্জিকা।

২২ শে শ্রাবণ, ১৩৮০। আমি প্রেসে ২১ নং ফর্মার প্রুফ দেখছি। হঠাৎ এসে গণ্ডগোল বাঁধালো মাদ্রাসার একদল ছাত্র। তারা প্রেস ক্লাবে বইখানা ছাপাতে নিষেধ করল। শুধু নিষেধ নয়, তারা হুমকি দিল যে তাদের নিষেধ অগ্রাহ্য করলে প্রেসের ওপর জুলুমও হতে পারে। অগত্যা প্রেস কর্তৃপক্ষ আমার বইখানা ছাপার কাজ বন্ধ করে দিলেন। ছাত্ররা আরো প্রস্তাব দিল যে, বইয়ের ছাপা ফর্মাগুলো তাদের দেখাতে হবে। পড়ে শুনে মনঃপূত হলে তার অনুমতি দেবে আর না হলে ছাপা কাজ বন্ধই রাখতে হবে। বাড়াবাড়ি না করে আমি ছাত্রদের প্রস্তাবে সম্মত হলাম। ফর্মাগুলো তাদের দেখাবার স্থান হলো বরিশালের কলেজ রোডস্থ অধ্যাপক মোঃ বাকের আলী সাহেবের বাসা। সময় পরের দিন চারটা।

২২ শে শ্রাবণ, ১৩৮০। যথাক্রমে আমি প্রেস থেকে উক্ত বইয়ের এক থেকে বিশ ফর্মার একগুচ্ছ নিয়ে অধ্যাপক বাকের আলী সাহেবের বাসায় যাচ্ছিলাম। রাস্তা

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

থেকে দেখা গেল যে তাঁর বৈঠকখানায় কোনো লোকজন নেই। তাই সেখানে একা বসে থাকতে ইচ্ছে করল না। অদূরেই আমার সুপরিচিত অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদির সাহেবের বাসা। আমি সে বাসার দিকে চলতে থাকলাম। আমার অজ্ঞাতে কতিপয় ছাত্র আমার অনুগমন করেছিল। আমি কাদির সাহেবের বাসায় ওঠার সাথে সাথে এক ঝাঁক ছাত্র আমার পিছু পিছু গিয়ে কাজী সাহেবের বারান্দা ভরে গেল। সাড়া পেয়ে কাজী সাহেব দরজায় দাঁড়িয়ে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমরা এখানে কেন?

ছাত্রদের একজন বলল, উনি একখানা বই ছাপাচ্ছেন। সেই বইখানা আমাদের দেখবার কথা ছিল।

কাজী সাহেব ছাত্রদের প্রশ্ন করলেন, মাতুব্বর সাহেব বই ছাপাচ্ছেন জানলে কি করে?

ছাত্রদের একজন উত্তর দিল, আল আমিন প্রেসে গিয়ে।

কাদির সাহেব বললেন, তোমরা ছাত্র, প্রেসে গিয়েছিলে কেন?

ছাত্রদের আর একজন উত্তর দিল, প্রেসে আমাদের যাতায়াত আছে।

কাজী কাদির সাহেব বললেন, বইখানা ছাপা হলে তো সকলেই দেখবে আর তোমরাও দেখতে পাবে। ছাপা বা প্রকাশের পূর্বে তোমাদের দেখবার আবশ্যক কি?

উত্তর এল, বইখানাতে আপত্তিজনক কিছু আছে কি না তাই দেখার। কাজী সাহেব বললেন, আপত্তিজনক যদি কিছু থাকে প্রকাশের পর তার জন্য আইনসঙ্গত ব্যবস্থা নিতে পারো। কিন্তু প্রকাশের পূর্বে তা তোমাদের দেখবার অধিকার কি?

ছাত্ররা নিরুত্তর।

কাজী সাহেব প্রশ্ন করলেন, বরিশালে বহু প্রেসে বহু বই ছাপা হচ্ছে। তোমরা সে সব বই দেখো কিনা?

ছাত্ররা নীরব।

কাজী সাহেব বললেন, যান মাতুব্বর সাহেব, বাকের আলী সাহেবের বাসায় গিয়ে ওদের বই দেখান।

আমি বাকের আলী সাহেবের বাসায় যেতে থাকলাম। বাসার অল্প দূরে থাকতেই বিশ-পঁচিশ জন ছাত্রের একটি দল আমাকে ঘিরে ফেলল। উচ্ছৃঙ্খল ছাত্ররা আরো উচ্ছৃঙ্খল হলো এবং শালীনতা হারিয়ে ফেলল। কেউ আমার জামা ধরে টানতে লাগল, কেউ হাত ধরে। একজন ছাত্র আমার বাম পাশ পকেট থেকে 'সত্যের সন্ধান' বইয়ের ফরমাগুলোর বান্ডিল জোরপূর্বক টেনে নিয়ে গেল। আমি হতবাক ও স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে থাকলাম ছাত্রদের দ্বারা অবরুদ্ধ হয়ে। ছাত্ররা প্রায় চেপে ধরে ঠেলাঠেলি করে আমাকে অন্যদিকে নিয়ে চলল। জানি না ওদের উদ্দেশ্য কি ছিল। হঠাৎ সেখানে কাজী শামসুল হুদা (অধ্যাপক কাজী গোলাম কাদিরের কনিষ্ঠ সহোদর) এসে পড়লেন এবং আমাকে নিরাপদে ফিরতে সাহায্য করলেন আর এ কারণে আমাকে আত্মগোপন করে থাকতে হলো তিন-চার মাস।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এরপর উক্ত ছাত্ররা ফরমাগুলো নিয়ে নষ্ট করে ফেলার উদ্দেশ্যে একদিন বলপূর্বক প্রেসের গুদামে ঢোকার চেষ্টা করে। প্রেস থেকে আমি যেন ছাপানো ফর্মাগুলো সরিয়ে অন্যত্র নিতে না পারি সেজন্য ছাত্ররা কিছুদিন কড়া নজর রাখে। মাসাধিককাল পরে ছাত্রদের তৎপরতা কিছুটা হ্রাস পেলে অতি গোপনভাবে বহুকষ্টে ফর্মাগুলো ঢাকায় নিয়ে যাই এবং অধ্যাপক শরফুদ্দিন হাই সাহেবের সহায়তায় বইটির বহিরাংশ ঢাকায় বর্ণমিছিল প্রেসে ছাপিয়ে ছাপার কাজ প্রায় সমাধা করি।"

পড়া শেষ হলে হাসনাত মুখ তুলে তাকালো। শামসুল হক সাহেব মিটিমিটি হাসছেন। বললেন, কেমন লোমহর্ষক মনে হলো না? খুব কম বইই এমন ঝুঁকি নিয়ে, টেনশনের মধ্যে ছাপানো হয়েছে।

হাসনাত বলল, তাই তো দেখছি। ছাপার পর বইটির ডিসট্রিবিউশন কীভাবে হলো। সেটাও বিপজ্জনক ব্যাপার হওয়ার কথা।

সে আর এক কাহিনী। বর্ণমিছিলে ছাপানোর পর মাতুব্বর সাহেব দুশো কপি নিয়ে বরিশালে আসছেন লঞ্চে। সহযাত্রী এক ব্যক্তির কাছে বইয়ের বান্ডিল রেখে তিনি টয়লেটে গেছেন। এসে দেখেন বান্ডিল উধাও, সহযাত্রী নিশ্চিন্তে ঘুমুচ্ছে। খোঁজ করে পাওয়া গেল না। মাতুব্বর সাহেব আবার বর্ণমিছিল প্রেসে গেলেন নতুন কপির জন্য দেখা গেল বাইন্ডারের গুদামে বইয়ের একটি ফর্মাও নেই। ৭০০ কপির সমস্ত ফর্মাগুলোই উধাও। অগত্যা দ্বিতীয় মুদ্রণ করতে হলো তের হাজার টাকা ব্যয়ে। তাজুল ইসলাম বেশিরভাগ খরচ বহন করলেন, বাকিটা মাতুব্বর সাহেব।

বেশ কিছুদিন পর ঢাকার জগন্নাথ কলেজের এক ছাত্র শফিকুর রহমান মাতুব্বরের কাছে এক চিঠি লিখে জানালো যে সে সদর ঘাটের ফুটপাত থেকে 'সত্যের সন্ধান' বইটির এক কপি কিনেছে। সে লিখল "আপনার সঙ্গে আমার বয়সের আকাশ পাতাল তফাৎ। কিন্তু ভূমিকায় যে ফজলুল করিম ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের নাম উল্লেখ করেছেন তিনি আমার নানা ছিলেন। আপনার বক্তব্য আমার ভালো লেগেছে। ঢাকায় এলে অবশ্যই আমাদের বাসায় আসবেন। আমার নানার দুর্ব্যবহারের জন্য আমি দুঃখিত।" এরপর বাসাবোতে তাদের বাসার ঠিকানা লেখা।

বুঝতেই পারছেন লঞ্চে বান্ডিলে মূল্যবান সামগ্রী আছে মনে করে চুরি করেছিল কেউ। পরে বোধকরি সের দরে ফুটপাতের কাছে বিক্রি করে দিয়েছে। তারই একটি কিনেছিল ঐ শফিকুর রহমান। চিঠিতে সে উল্লেখ করেছিল যে, বইটি তাকে তিনগুণ বেশি দিয়ে কিনতে হয়েছে।

বইটি বেরুনোর সঙ্গে সঙ্গে আলোড়ন পড়ে যায় ঢাকার বুদ্ধিজীবী মহলে। একে তো মফঃস্বলের এক অখ্যাত অর্ধশিক্ষিত কৃষকের লেখা, তার উপর এমন স্পর্শকাতর বিষয়বস্তু। প্রথমে অবিশ্বাস এবং তারপর দারুণ কৌতূহল নিয়ে পড়তে শুরু করলেন ঢাকার বুদ্ধিজীবী মহল।

ঢাকায় তাঁর বই প্রচার হলো কীভাবে? হাসনাত তাকায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামসুল হক বলেন, মাতুব্বর সাহেবের দৃঢ় সংকল্প আর অধ্যাবসায় এখানেও কাজ করেছে। তবে তিনি বেশ কয়েকজনের সাহায্য পেয়েছিলেন। তাঁরাই তাকে ঢাকায় বুদ্ধিজীবী মহলে পরিচয় করিয়ে দেন।

বাসাবোর বাসা থেকে প্রায় প্রতিদিন তোপখানা রোডে আবুল হাসনাত সাহেবের বাড়ির সামনে ঘোরাঘুরি করে আব্দুল খালেক মাতুব্বর। দেখা যায় না। শেষে একদিন বই এর এক কপি রেখে চলে যায়।

আরজ আলী মাতুব্বর ছেলের দিকে তাকিয়ে বলেন, দিয়ে এসেছ বাবা?

হ্যাঁ।

দেখা হয়নি?

না।

ওহ্। যাক বইটাতো পড়া হোক। তারপর একদিন গিয়ে জেনে এসো মতামত।

ওদের মতামতের কি প্রয়োজন? আপনি লেখার তাগিদ অনুভব করেছেন। বই লিখেছেন। যারা আগ্রহী পড়বেন। ছেলে তাঁর দিকে তাকায়।

আরজ আলী মাতুব্বরের প্রশান্ত হাসি মুখে নিয়ে বললেন, এরা আমার চেয়ে অনেক বড় পণ্ডিত। অনেক লেখাপড়া করেছেন। কলেজ, ইউনিভার্সিটি পড়া। নিজেদের মধ্যে এইসব বিষয় নিয়ে নিয়মিত আলোচনা করেন।

কি করে জানলেন। এদের কথা? আব্দুল খালেক মাতুব্বর বাবার তিকে তাকায়।

হঠাৎ করেই বলতে পারো। একদিন নৌকায় করে যাচ্ছি। ছেঁড়া একটা কাগজে দেখলাম ঢাকায় 'মিলন সংঘ' বলে মুক্ত বুদ্ধির চর্চার এক মজলিস আছে আবুল হাসনাত সাহেবের বাড়িতে তাদের আসর বসে। সেই কাগজ পড়ে কৌতূহল হলো। ঠিকানা নিয়ে নিলাম। ভাবলাম এঁরা আমার বইটা পড়ে বলতে পারবেন আমার চিন্তা সঠিক পথে এগুচ্ছে কিনা।

আব্দুল খালেক মাতুব্বর আবার কিছুদিন পর তোপখানা রোডে আবুল হাসনাত সাহেবের বাড়িতে গিয়ে ঘোরাঘুরি করল। তারপর ভেতর থেকে ডাক এল। গোলগাল নাদুস-নুদুস ফর্সা চেহারার লোকটি ইজিচেয়ারে বসে কাগজ পড়ছেন। তাকে দেখে তাকালেন জিজ্ঞাসু চোখে।

খালেক মাতুব্বর তার পিতার বইটির কথা বলল।

আবুল হাসনাত সাহেব বললেন, ওহ্ তোমার পিতার বই? তিনি কোথায়? কী করেন?

বরিশালের গ্রামে থাকেন। চাষ-বাস করেন। মাঝে মাঝে ঢাকায় এসে আমার বাসায় ওঠেন। এখন ঢাকাতে আছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শুনে আবুল হাসনাত সাহেব কিছুক্ষণ কাগজ একপাশে রেখে দিয়ে খালেক মাতুব্বরকে দেখলেন। তারপর উৎসাহের সঙ্গে বললেন, তোমার পিতাকে নিয়ে এসো। কালই আসতে বলো তাঁকে। আমাদের সভা আছে।

পরদিন মিলন সংঘের সভায় আরজ আলী মাতুব্বরকে পরিচয় করিয়ে দিলেন আবুল হাসনাত সাহেব। প্রিন্সিপাল সাইদুর রহমান মুখে বড় একটা হাসি এনে বললেন, বুঝলেন মাতুব্বর সাহেব আমার বাড়িটার নাম দিচ্ছি সংশয়। সংশয় মানে ডাউট দিয়েই সব জ্ঞানের শুরু। সংশয় থাকলেই মন অস্থির থাকে, নানা প্রশ্ন করা শুরু হয়। সেই থেকে সত্যের অনুসন্ধান।

আরজ আলী হেসে শান্তস্বরে বললেন, হ্যাঁ। আমি মোটামুটি সেই পথে থাকার চেষ্টা করেছি। আপনাদের মতো অত জ্ঞান বা গুণ নেই। এখানে দাঁড়াবার অধিকার আছে কিনা সেটাও আমি প্রশ্ন করি।

আবুল হাসনাত বললেন, পুঁথিগত পড়াশুনাই বড় কথা নয়। অনেক পড়াশুনা করেও লোকে মূর্খ থাকে। আপনি নিজেকে যেভাবে সুশিক্ষিত করেছেন তার তুলনা হয় না। আজ থেকে আপনি মিলন সংঘের একজন সদস্য।

বুঝলেন হাসনাত সাহেব, সেই থেকে মাতুব্বর সাহেব প্রতি মাসে ঢাকা আসেন অন্তত একবার মিলন সংঘের সভায় যোগ দিতে। তাঁর ছেলে ডিআইটিতে চাকরি করত। এখনো করছে। তার বাসাবোর বাসা থেকে হেঁটে তিনি যেতেন তোপখানা রোড। ছসাত মাইল তো হবেই। কোনোদিন রিকশা চড়েননি। বরিশালেও নিজ গ্রাম থেকে শহরে সত্তর বছর ধরে পায়ে হেঁটে আসা-যাওয়া করেছেন। নৌকা না, লঞ্চ না। অসম্ভব পরিশ্রমী আর সুশৃঙ্খল মানুষ ছিলেন, শামসুল হক বললেন।

হাসনাত বলল, 'সত্যের সন্ধান' বইয়ের পেছনে বেশ কিছু চিন্তাবিদের মন্তব্য দেখতে পাচ্ছি। তাঁর বইটা পেলেন কেমন ভাবে?

শামসুল হক বললেন, আমি চিঠি দিয়ে ঢাকায় পাঠিয়েছি। কাজী গোলাম কাদির, শরফুদ্দিন, রেজা হাই তারাও মাতুব্বরের বইয়ের জন্য যোগাযোগ করেছেন। একটা কথা বলি, কাউকে কিন্তু চাপ দিতে হয়নি বইটির উপর মতামতের জন্য। পড়ে মুগ্ধ হয়ে স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়েই তারা লিখেছেন। একেবারে নতুন ধরনের লেখা তো! তার উপর মাতুব্বরের পরিচয় চমৎকৃত করেছে সবাইকে।

আইয়ুবের হাতে কয়েকটি পুরনো খাতা, সেলাই করা হলেও ছিঁড়ে পড়ে যাওয়ার মতো অবস্থা। তাকে খুব আনন্দিত দেখাচ্ছে।

হাসনাত বলল, এসব কি?

আইয়ুব হাসিমুখে বলল, আরজ আলী মাতুব্বরের অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি। লামচরি গ্রামে তার প্রতিষ্ঠিত লাইব্রেরিতে ছিল। আমি সেখানে গিয়ে খুঁজে নিয়ে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

এসেছি। এখানে আছে পাঁচ খণ্ডে লেখা "ভিখারীর জীবন চরিত্র" আর দিন-লিপি অর্থাৎ ডায়েরী মোট দুই খণ্ড। দেখলে অবাক হবেন। আরজ আলী মাতুব্বর গত ত্রিশ বছর ধরে, প্রতিদিনের ঘটনা লিখে রেখেছেন। সব ঘটনা নয়, প্রধান প্রধান ঘটনা।

হাসনাত কৌতূহলী হয়ে হাত বাড়ালো। পাণ্ডুলিপিগুলো নিয়ে পাতা উল্টে দেখল। ছোট ছোট অক্ষর, গোটা গোটা নয়। কিন্তু পড়তে অসুবিধা হয় না। সস্তা কালি ব্যবহৃত হয়েছে, দীর্ঘ সময়ের ব্যবধানে একটু অস্পষ্ট হয়ে এসেছে কোথাও কোথাও।

দিনপঞ্জীতে ঢাকায় আগমনের সন তারিখ বেশ যত্ন করে লেখা, যেন এটার উপর বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। কেন দিলেন, পড়তে পড়তে আরো স্পষ্ট হলো। প্রতিবার এসে দেখা করেছেন ঢাকার লেখক, পণ্ডিতদের সঙ্গে। পত্রিকা অফিসে গিয়েছেন। ইউনিভার্সিটিতে দেখা করেছেন অধ্যাপকদের সঙ্গে, যারা লেখেন, পড়েন, মুক্তচিন্তার মানুষ বলে পরিচিতি আছে। তাঁর লেখা তাদের পড়তে দিয়েছেন।

আইয়ুব বলল, বোঝা যায় ঢাকায় আসতেন এখানকার ইনটেলেকচুয়াল সার্কেলে পরিচিত হতে। তাঁর লেখা সম্বন্ধে তাদের মতামত গ্রহণ করতে।

তাঁকে তাহলে পাবলিসিটি প্রিয় বলতে হয়। হাসনাত তাকালো আলী নুরের দিকে। তাঁর চেম্বারে বসে কথা হচ্ছিল।

আলী নুর কিছুক্ষণ ভাবলেন, তারপর বললেন, সবাই স্বীকৃতি চায়। তিনি যদি চেয়ে থাকেন তাতে দোষণীয় কিছু নেই। বিশেষ করে যে দুঃখ-কষ্টের মধ্যে তাঁর বুদ্ধিবৃত্তির চর্চা, জ্ঞান-সাধনা তারপর গুণীজনদের কাছে পরিচিত হবার বাসনা তো একটু থাকবেই। কিন্তু এর চেয়ে বড় কারণ বোধকরি ছিল তাঁর লেখার যথার্থতা, প্রাসঙ্গিকতা যাচাই করে নেওয়া।

আইয়ুব বলল, সেই জন্য বিভিন্ন ব্যক্তির মতামত সংগ্রহ করার জন্য খুব আগ্রহী ছিলেন। দিন-লিপিতে দেখা যায় কোনো কোনো অধ্যাপকের কাছে একাধিকবার গিয়েছেন তাঁর লেখার উপর মন্তব্যের জন্য। যেদিন খালি হাতে ফিরেছেন সেদিন শুধু লিখেছেন, লেখা পাওয়া গেল না, কোনো ক্ষোভ অভিমান বা জ্বালা নেই সেই ব্যর্থতায়। বোঝাই যায় যে আবার যাবেন। খুব দৃঢ় প্রতিজ্ঞা।

আলী নুর বললেন, সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলো যারা তাঁর লেখা পড়ে মন্তব্য দিয়েছেন তাঁরা ভালোভাবে পড়ে বেশ দীর্ঘ, প্রায় প্রবন্ধের আকারে লিখেছেন। দায়সারা গোছের কর্তব্য পালন করেননি কেউ।

আইয়ুব বলল, এইসব মন্তব্য তিনি নিজে বিভিন্ন পত্রিকা অফিসে গিয়ে ছাপতে দিয়েছেন। এটাও একটা ধৈর্যের আর নিষ্ঠার ব্যাপার। সবকিছু মিলে মনে হয়, লেখা নয়, তিনি কোনো গভীর তপস্যায় মগ্ন, যার আচার-অনুষ্ঠান তাকে কখনো নিয়ে যাচ্ছে লাইব্রেরিতে, কখনো ইউনিভার্সিটি এলাকায় ছাত্র-অধ্যাপকদের সংস্পর্শে, কখনো পত্রিকা অফিসে, কখনো আলোচনা সভায়।

হাসনাত আইয়ুবকে বলল, কী করবে পাণ্ডুলিপিগুলো দিয়ে?

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইয়ুব বলল, দেখি ছাপা যায় কিনা। যেভাবে পড়েছিল লামচরি গ্রামের লাইব্রেরিতে, তাতে আর কিছুদিন পর নষ্টই হয়ে যেত। অথচ শুনেছি, আমি এগুলো নিয়ে আসায় লাইব্রেরির ম্যানেজিং কমিটি বেশ ক্ষুব্ধ হয়েছে।

হাসনাত বলল, আরজ আলী মাতুব্বর যে খুব ডিসিপ্লিনড মানুষ ছিলেন, এই দিনপঞ্জী পড়লে বোঝা যায়। আমরা যারা তাকে জীবিতকালে দেখিনি তাদের জন্য এই ডায়েরি একটা বড় বিষয়। তাকে পরিচিত করে তুলতে অনেক সাহায্য করবে।

আলী নুর বললেন, শুধু ডিসিপ্লিনড নয় খুব মেথোডিক্যাল ছিলেন। ও যা করতে চেয়েছেন সুপরিকল্পিতভাবে করেছেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করা পর্যন্ত।

হাসনাত 'দিন-লিপি'র পাতা উল্টাতে উল্টাতে বলল, ঢাকায় পয়ষট্টি বার এসেছেন বলে দেখা যাচ্ছে। প্রতিবারই লেখার জন্য, লেখা ছাপানো, মন্তব্য সংগ্রহ, মন্তব্য ছাপানো। দারুণ অবসেসন হয়ে গিয়েছিল।

আলী নুর হেসে বললেন, ডেভোশন। জ্ঞান চর্চার জন্যই জীবন, এ রকম একটা বিশ্বাস তাঁর ছিল।

আইয়ুব হেসে বলল, আবার বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি, এমনটাও ভাবেননি। ঘর-সংসার করেছেন, জমি-জমা কিনেছেন।

হাসনাত বলল, ধরা যাক তিনি আর দশজন মানুষের মতো লেখাপড়া শেখার সুযোগ পেতেন। এম, এ বা এম, এস-সি ডিগ্রি নিয়ে চাকরি করতেন, তাহলে কি জ্ঞান চর্চার প্রতি এই ডেভোশন থাকত?

আলী নুর মাথা ঝাঁকালেন কিছুক্ষণ, তারপর বললেন, বড় শক্ত প্রশ্ন।

আইয়ুব হেসে বলল, থাকত না। চাকরি প্রোমোশন, অথবা ব্যবসায় প্রসার এই নিয়ে বেশি সময় কাটাতেন। তার জীবন অন্য খাতে বইতো।

তুমি নেচার-নার্চারের পুরনো বিতর্কটি তুলে ধরেছ। কিন্তু এ বিষয়ে কোনো পক্ষ নির্ভুল তা কিন্তু এখনো প্রতিষ্ঠিত হয়নি। আলী নুর তাকালেন আইয়ুবের দিকে।

হাসনাত বলল, তাহলে আইয়ুবের পক্ষে এমন যুক্তি দেওয়ার বাঁধা নেই। তারপর আইয়ুবের দিকে তাকিয়ে বলল, এই অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি এনে তুমি ভালো করেছ। ছেপে বার করলে পাঠকরা পড়ে অবাক তো হবেই, উপকৃতও হতে পারে। যারা তাঁর বই সম্বন্ধে মন্তব্য করেছেন তাঁরাও জানতে পারবেন তাঁদের কাছ থেকে লেখা সংগ্রহ করতে আরজ আলী মাতুব্বরকে কতবার ঢাকা আসতে হয়েছে, কতবার মাইলের পর মাইল হেঁটেছেন, বরিশাল, ঢাকায়।

হাসনাত 'সত্যের সন্ধান' বইটির শেষে আলাদা করে সঙ্কলিত মন্তব্যের পুস্তিকাটি পড়তে থাকে। ১৩৮১ সালে ঈদ সংখ্যা ইত্তেফাকে সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী লিখেছেন: "শুধু জিজ্ঞাসা করেছেন, চিৎকার করেননি, আঘাত করেননি কারো ধর্ম

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

বিশ্বাসে। বস্তুত তিনি অধার্মিক হয়তো নন। ধর্মের যে অংশটি রূপকথা অথবা অতিকথা তাকে তিনি পৃথক করতে চেয়েছেন ধর্ম থেকে। অতিকথাকে (মিথ্যা) তিনি ক্ষতিকর মনে করেন বেশি, মিথ্যা কথার তুলনায়। কেননা, মিথ্যাকে মিথ্যা বলে চায় না। মিথ্যাকে জানা যায় না।

আরজ আলী মাতুব্বরের জিজ্ঞাসা জীবনের জিজ্ঞাসা, তার নিরীহ লণ্ঠন বিস্ফোরক আসলে। লণ্ঠনে কাজ হবে না, বিস্ফোরক চাই, অনেক অনেক বিস্ফোরক।

আসলে গল্প ও রূপকথার বিরুদ্ধেই এই বই। মনের ভুবন থেকে ছিনিয়ে নিতে চান তিনি, রূপকথাকে দিতে চান ঘুচিয়ে, সত্যকে দেখতে চান তার অবিচল, অচঞ্চল প্রসাধনবিহীন রূপে।"

দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ লিখেছেন, "তত্ত্ব জিজ্ঞাসা যে মানবমনের আদিম বৃত্তি, এ বই পাঠে তা সর্বতোভাবে উপলব্ধি করা যায়। কোন স্কুল কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত কোন দার্শনিক তত্ত্বের সঙ্গে পরিচিত না হয়েও মাতুব্বর সাহেব যেসব প্রশ্ন তুলেছেন সেগুলো বাস্তবিকই প্রণিধানযোগ্য।

মাতুব্বর সাহেব ধর্মের জাগতিক বা স্থান কালে অবস্থিত দিকের প্রত্যয়নগুলো নানবিধ প্রশ্ন তুলেছেন। আমাদের মনে হয় প্রশ্নগুলো সঙ্গত। কারণ এগুলোকে তর্কের অতীত বলে গ্রহণ করে অন্ধ বিশ্বাস পোষণ করা থেকে ওদের সম্বন্ধে পরিচ্ছন্ন ধারণা গ্রহণ করতে হলে এসব প্রশ্নই প্রাসঙ্গিক। ইংরেজ কবি টেনিসন বলেছেন, পুরোপুরি বিশ্বাস না করা থেকে নিরাসক্তভাবে সন্দেহ পোষণ করাও ভালো। মাতুব্বর নিরাসক্ত সন্দেহবাদীর ভূমিকা গ্রহণ করেছেন বলে তিনি সত্যিই সকলের প্রশংসার যোগ্য।"

দর্শনের অধ্যাপক ডক্টর আব্দুল মতিন লিখেছেন, "লেখক প্রশ্ন তুলেছেন, জিজ্ঞাসা রেখেছেন, উত্তর দেবার চেষ্টা করেননি বললেই চলে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই উত্তর প্রচ্ছন্ন রয়েছে তাঁর প্রশ্নে। কেবল বুদ্ধিমানের মত প্রশ্ন করতে পারাটাই কম কৃতিত্বের কথা নয়। বস্তুতঃ মানুষের উন্নতি বুদ্ধিবৃত্তির আসল পরিচয় উত্তর খুঁজে পাওয়ার মধ্যে নয়, প্রশ্ন করার মধ্যেই। প্রশ্নের ধরন দেখে কারো কারো মনে হতে পারে যে তিনি নিজে ধর্মবিশ্বাসী নন বা ধর্মকে তিনি হেয় প্রতিপন্ন করতে চান। কিন্তু আসলে তিনি তাঁর জিজ্ঞাসা রেখেছেন অন্ধ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে, ধর্মের মূল শিক্ষার বিরুদ্ধে নয়।"

অধ্যাপক মনিরুজ্জামান মিয়া লিখেছেন "সবগুলো আলোচনাতেই যা লক্ষণীয় তা হলো লেখকের সত্যসন্ধ দৃষ্টি ও যুক্তিবাদী মন। আরও লক্ষণীয় যে বিভিন্ন যুক্তির অবতারণা করতে গিয়ে তিনি একাধারে ইতিহাস, ধর্ম, দর্শন, নৃতত্ত্ব, মনোবিদ্যা, জীববিদ্যা প্রভৃতি বিষয় থেকে তথ্যের সমাবেশ ঘটিয়েছেন। কোন কোন সময় তিনি প্রাঞ্জলভাবে এমন কতগুলো সাধারণ যুক্তির অবতারণা করেছেন যা হয়ে উঠেছে সরস অথচ অকাট্য।"

হাসনাত পড়া শেষ করে ঘড়ির দিকে তাকালো। প্রায় পাঁচটা বাজে। ব্যস্ত হয়ে বলল, যাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামসুল হক সাহেব বললেন, এফতার করে যান। রাস্তায় কোথাও এফতার পাবেন না।

হাসনাত বলল, এফতারের সময় হবার আগেই বাসায় পৌঁছে যাবো। বইগুলোর জন্য ধন্যবাদ। আপনার যা বিশাল লাইব্রেরি দেখলাম তাতে মনে হচ্ছে মাঝে মাঝেই আসতে হবে।

শামসুল হক বললেন, আসবেন। মাতুব্বর সাহেব প্রায়ই আসতেন। ঢাকায় এলেই বাসে করে চলে আসতেন। আলাপ করতেন, আলোচনা করতেন, বই পড়তেন, পড়ার ঘরে অথবা সোফায় গা গড়িয়ে নিতেন। সন্ধ্যার আগে চলে যেতেন। হাসনাত হেসে বলল, আদর্শ পাঠাগার গড়ে তুলেছেন আপনি। থাকা খাওয়ার সুবন্দোবস্ত করতেও ভোলেননি।

সেই দিন সন্ধ্যায় আলী নুরের ফোন এল। তিনি উৎসাহের সঙ্গে বললেন, মাতুব্বর সাহেবের উপর নতুন জিনিস পাওয়া গিয়েছে। আপনার কাজে লাগবে।

হাসনাত বলল কি?

তাঁর জীবনী লিখেছে একজন। নাম আইয়ুব হোসেন। বাংলা একাডেমী থেকে বের করেছে। একুশের গ্রন্থমেলায় এবার কিছু কপি ছিল।

হাসনাত বলল, আইয়ুব সাহেবের দেখা কোথায় পাওয়া যাবে, তাঁর বইয়ের কপি?

আলী নুর বললেন, তিনি আমার সামনে বসে আছেন। বইয়ের কপি তিনিই পাননি।

হাসনাত ব্যস্ত হয়ে বলল, আসছি। আলী নুর সাহেবের বাড়ির চেম্বারে ঢুকে হাসনাত দেখল এক যুবক বসে আছে। তার সামনে একটি মলাটহীন চটি বই।

আলী নুর হেসে বললেন, দেখেন কী অদ্ভুত যোগাযোগ! আপনি মাতুব্বর সাহেব সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করছেন আর এদিকে আইয়ুব সাহেব তার জীবনী গ্রন্থ নিয়ে এসেছেন।

আইয়ুব হোসেন হেসে বলল, এটা প্রেস কপি। বাংলা একাডেমী সীমিত সংখ্যক কপি গ্রন্থমেলায় দিয়েছিল। আমি একটাও পাইনি। প্রেস কপিটা জোর করে নিয়ে এলাম।

হাসনাত চটি বইটা হাতে নিয়ে বলল, এটা কদিনের জন্য দিতে হবে।

আইয়ুব ইতস্তত করে বলল, এই বইটা এখন আমার কাছে সন্তানের মতো। একমাত্র কপি। হাত ছাড়া করতে ইচ্ছে করছে না।

আলী নুর বললেন, হাত ছাড়া হবে না। দুদিনেই পেয়ে যাবেন। হাসনাত ভাইও আপনার মতো মাতুব্বর সাহেবের অনুরাগী হয়ে পড়েছেন।

কবে থেকে? বলে আইয়ুব তাকালো হাসনাতের দিকে।

হাসনাত বলল, বছর তিনেক আগে আমি প্রথম তাঁর কথা শুনি। আমি আর নুর সাহেব জার্মান কালচারাল সেন্টার থেকে 'গ্যালিলিও' নাটকের অভিনয় দেখে আসছি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তখন প্রথম মাতুব্বর সাহেবের কথা জানালেন নুর সাহেব। সেই থেকে কৌতূহলী হয়ে পড়েছি। লিখব বলে ভাবলেও হয়ে ওঠেনি এতদিন। এবার শুরু করেছি।

আলী নুর বললেন, হাসনাত ভাই আবার লেখা ধরলে একবারেই শেষ করে ফেলবেন।

হাসনাত বলল, হ্যাঁ তখন আর আমার মাথায় অন্য কিছু থাকে না।

আইয়ুব বললেন, ১লা চৈত্র মাতুব্বর সাহেবের মৃত্যু দিবস। আমার বইটা বেরুলো, আপনার লেখাও বেরুচ্ছে। সব মিলিয়ে তাঁর মৃত্যু দিবসে একটা আলোচনা সভা করলে হয় না!

আলী নুর বলল, বেশ ভালো কথা। কী বলেন হাসনাত ভাই।

হাসনাত বলল, আমি সহযোগিতা করতে পারি, কিন্তু লেখার ব্যস্ততায় বেশি সময় দিতে পারব না। তারপর বলল, বাংলা একাডেমীকে বলে দেখা যেতে পারে। তাঁরা যখন আইয়ুব সাহেবের বইটা ছেপেছে, আগ্রহী হতে পারে।

আলী নুর বললেন, শুধু এই বই ছাপা কেন, বাংলা একাডেমী থেকে তাঁকে পহেলা বৈশাখে সংবর্ধনাও দিয়েছে। তাঁরাই আলোচনা সভার আয়োজন করলে সবচেয়ে ভালো।

আইয়ুব হোসেন বললেন, বাংলা একাডেমীতে মাতুব্বর সাহেবের বেশ কিছু গুণগ্রাহী আছে। কবি আসাদ চৌধুরী মাতুব্বর সাহেবের উপর লাইভ টিভি প্রোগ্রাম করেছেন।

আলী নুর বললেন, হ্যাঁ। দেখেছি। মাতুব্বর সাহেব গরু দিয়ে মাঠে হাল দিচ্ছেন আর আসাদ চৌধুরী তাঁর ইন্টারভিউ নিচ্ছেন, এই দৃশ্য এখনো মনে আছে। যদ্দুর মনে পড়ে দুতিন বার ঐ টিভি প্রোগ্রাম দেখানো হয়েছে। মাতুব্বর সাহেবের উপর।

হাসনাত বলল, শেষ পর্যন্ত একজন সেলিব্রিটি ফিগার হয়ে গেছিলেন তাহলে?

অনেকটা তাই। লেখক শিবির তাঁর প্রথম বই বেরুবার পর তাঁকে পুরস্কার দিয়েছিল। হুমায়ুন কাদির সাহিত্য পুরস্কার পেয়েছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গেলেই তাঁকে দর্শন বিভাগের ছাত্ররা বক্তৃতা দিতে বলত।

দিতেন তিনি? হাসনাত কৌতূহলী হয়ে তাকালো।

হ্যাঁ। দর্শন বিভাগের ছাত্রদের সামনে কয়েকবারই বক্তৃতা দিয়েছেন তিনি। অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, অধ্যাপক মতিন উদ্যোগী হয়ে নিয়ে যেতেন। কিন্তু একটা ব্যাপার, এইসব খ্যাতি প্রচারে তাঁর মাথা মুহূর্তের জন্যও খারাপ হয়নি। তিনি সব সময় বিনয়ের সঙ্গে বলতেন, "আপনাদের সামনে আসার কোনো অধিকার আমার নেই। শিক্ষায়-দীক্ষায়, জ্ঞানে গুণে কোনো বিচারেই আপনাদের সঙ্গে আমার তুলনা করা চলে না। আপনারা সহৃদয় হয়ে ডেকেছেন এজন্য আমি কৃতজ্ঞ" তাঁর এই বিনয় আর কৃতজ্ঞতাবোধ আজীবন লালন করেছেন তিনি।

আইয়ুব হোসেন ততক্ষণে অনুষ্ঠানের একটা কর্মসূচি লিখে ফেলেছে। কারা বক্তব্য রাখবেন, স্মরণিকায় কাদের লেখা থাকবে। কত খরচ হবে। যদি বাংলা একাডেমী সভার আয়োজন করতে না পারে, তাহলে বিকল্প ব্যবস্থা কি হতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসনাত চিন্তাগ্রস্তের মতো বলল, অনেক সমস্যা। কাল্পনিক উপন্যাস লেখা অনেক সহজ। কিন্তু জীবনীভিত্তিক উপন্যাস লেখা কঠিন। কল্পনাকেও বেশিদূর প্রশ্রয় দেওয়া যায় না, আবার বেশি তথ্যভিত্তিক হলে মনে হবে নিছক জীবনী। ব্যালান্সিংটাই সমস্যা।

'সুলতান' উপন্যাসে সেটা পেরেছিলেন। আলী নুর বললেন। হাসনাত বলল, হ্যাঁ। মোটামুটি। কিন্তু কোনো দুটি মানুষের জীবন এক নয়। একটি নিয়ে লিখতে গিয়ে সফল হলেই অন্যটিতেও হওয়া যাবে এমন বলা যায় না।

আলী নুর বললেন, একবার শুরু করলে পারবেন।

হাসনাত বলল, দেখি।

আলী নুর ড্রয়ার থেকে ডিমাই সাইজের সবুজ মলাটের সুলভ সংস্করণের একটি বই বের করে হাসনাতের দিকে এগিয়ে বলল, আমার বইটা অফিসে খুঁজে পেয়েছি। এই যে দেখুন। এখানে তিনটি বিষয়ের উপর তথ্য পাবেন।

হাসনাত 'স্মরণিকার' বইটির পাতা উল্টাতে উল্টাতে অন্যমনস্কের মতো বলল, কোন তিনটি?

আলী নুর বললেন, তাঁর সমাধি নির্মাণ, দেহ উৎসর্গ আর লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠা। তিনটি ঘটনাই চমকপ্রদ।

দেহ উৎসর্গ? কি বলছেন বুঝতে পারছি না।

আলী নুর হেসে বললেন, 'স্মরণিকায়' সব লেখা আছে বিশদভাবে। পড়ে দেখবেন।

AMARBOI.COM

ঘরের মধ্যে সবাই চুপচাপ বসে আছে। আরজ আলী মাতুব্বর তাঁর স্ত্রী আর পুত্র কন্যাদের দিকে তাকালেন। মাথায় হাত দিয়ে চুল সমান করলেন। পাঞ্জাবিটা হাঁটু পর্যন্ত টেনে দিলেন। তারপর সোজা হয়ে চেয়ারে বসে বললেন।

তোমাদের অনেকবার আমার জীবনের কাহিনী শুনিয়েছি। কীভাবে আমার পিতার পাঁচ বিঘা জমি নীলামে বিক্রি হয়, কীভাবে ভিটেটুকুও চলে যায় সুদখোরের অত্যাচারে। কীভাবে আমার মা দুঃখে-কষ্টে আমাকে মানুষ করেছেন, আমার জন্ম, কৈশোর যৌবন সম্বন্ধে তোমরা ওয়াকিবহাল আছ। তোমরা আমার জীবনের বাকি অংশও নিজ চোখে দেখেছ এবং সব কিছু জানো। আমি যা কিছু করেছি, যা কিছু পেয়েছি, জমি-জমা, ঘর-বাড়ি, বিদ্যাবুদ্ধি সবকিছুই নিজ চেষ্টায়। আরো অনেক সহৃদয় ব্যক্তি সাহায্য করেছেন। তাদের নামও তোমরা শুনেছ আমার কাছ থেকে।

সব মানুষকে একদিন বিদায় নিতে হয়। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। আমার বিদায়ের সময়ও হয়ে এসেছে। আমি তার ইঙ্গিত পাই আজকাল। যানবাহনের, লঞ্চ-স্টীমারের যেমন ইঞ্জিন আমাদের বুকেও তেমনি হৃদপিণ্ড। ইদানীং আমার সেই ইঞ্জিন দুর্বল হয়ে এসেছে। যে কোনো দিন বিকল হতে পারে। আমি টের পাই।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আমি জীবিতকালেই আমার কবর তৈরি করে সমাধির ব্যবস্থা করেছি। সেখানে বয়ামে আমার একটি নখ, একটি দাঁত ও একটি চুল রেখে মাটি চাপা দিয়েছি। তোমরা এবং গ্রামের মানুষ অবাক হয়েছ। কেউ কেউ ওজর আপত্তি তুলেছ। প্রশ্ন করেছ, এটা কি করে কবর হয়? কেন হবে না? কবরে মানুষের দেহাবশেষ থাকে। আমিও আমার দেহের যে সব অঙ্গ ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে না সে সব নিদর্শন রেখে দিয়েছি যত্নের সঙ্গে। বয়ামে একটি চুল, একটি নখ, আর একটি দাঁতও যা সবগুলিও তাই। শুধু হাড়, কঙ্কাল রাখি নাই। আমার মৃত্যুর পর সেই কঙ্কাল কবরে থাকবে না।

আরজ আলী থামলেন। ছেলে-মেয়েরা অবাক হয়ে তাঁর কথা শুনছে। তাঁর স্ত্রী চোখে আঁচল দিয়ে কিছু মুছতে চেষ্টা করছেন।

আরজ আলী বললেন, আমার এই দেহ আমি মেডিকেল কলেজকে দান করেছি। মৃত্যুর পর আমার মৃতদেহের মালিক হবে মেডিকেল কলেজ।

বলেন কি আপনে? তাঁর স্ত্রী বাষ্পরুদ্ধ স্বরে বলেন।

আমি যা বলি ঠিকই বলি। হ্যাঁ, আমার মৃত্যুর পর এই দেহ কবরস্থ করার প্রয়োজন নাই। বিজ্ঞানের স্বার্থে আমি মৃতদেহ মেডিকেল কলেজকে দান করে যেতে চাই।

তা কি করে হয় আব্বা? তাঁর বড় ছেলে তাকায়।

আমরা কীভাবে এটা মেনে নেবো? মেজ ছেলে বলে।

আরজ আলী দৃঢ়স্বরে বলেন, এই আমার সিদ্ধান্ত। অনেক ভেবেচিন্তে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছি আমি। এর হেরফের হবে না। তোমরা সিদ্ধান্ত মেনে নেবে এই আমি চাই।

ছেলেমেয়েরা একে অন্যের দিকে তাকায়, নিজেদের মধ্যে চাপাস্বরে কথা বলে। তাদের মা মুখে আঁচল চেপে অঝোরে কাঁদতে থাকেন। টিনের ঘরটি হঠাৎ গমগম করে ওঠে। শীতের ঠাণ্ডা বাতাস ঘরের জানালা দিয়ে ভেতরে ঢোকে। সবাই যেন কেঁপে কেঁপে ওঠে।

আরজ আলী বলেন, তোমাদের কাছে কোনোদিন আমি কিছু চাই নাই। আজ বলছি তোমরা আমার অটল সিদ্ধান্ত পরিবর্তনের চেষ্টা করো না। আমার মতে কাজ করতে রাজি হও তোমরা।

ঘরের মধ্যে স্তব্ধতা বিরাজ করে। এক প্রান্ত থেকে যেন কে বলে ওঠে, যদি রাজি না হই!

আরজ আলী তাঁর দিকে রুষ্ট হয়ে তাকান। তারপর আস্তে আস্তে বলেন, আমার যেই পুত্র-কন্যা তা অমান্য করবে তাকে ত্যাজ্য করা হবে, সে বঞ্চিত হবে সম্পত্তি থেকে।

কথা কটি ঘরময় শব্দ তুলে ঘুরতে থাকে।

তাঁর স্ত্রী বলেন, গ্রামের সমাজ যদি না মানে?

কেন মানবে না? মানবে। পছন্দ করবে না, কিন্তু হাঙ্গামা-হুজ্জতও করবে না।

দেখলে না যখন কবর পাকা করি, ভেতরে বয়াম রেখে মাটি চাপা দিই তখন কি করেছিল গ্রামের মানুষ? রাজমিস্ত্রীদের সরে যেতে বলেছিল। শুধু আমি নিজ হাতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কবর সম্পন্ন করি। গ্রামের মানুষ সেই কবর ভাঙে নাই। হ্যাঁ, পছন্দ করবে না অনেকে, কিন্তু বাঁধা দেবে না। তোমরা আমার কথা শুনো। এটা খুব মহৎ কাজ, মানুষের সেবার জন্য আমি জীবিত অবস্থায় তেমন কিছু করতে পারি নাই। মৃত্যুর পর যদি আমার মৃতদেহ মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হয়, সেটা সৌভাগ্য।

বড় ছেলে খালেক মাতুব্বর বলে ঠিক আছে আব্বা, তাই হবে। আপনার শেষ ইচ্ছাকে আমরা সম্মান করব আমাদের খুব খারাপ লাগবে, কিন্তু আপনার কথার অমান্য হবে না।

আরজ আলী মাতুব্বর স্ত্রী-কন্যাদের দিকে তাকিয়ে থাকেন। বিকেলের রোদ ফিকে হয়ে এসেছে। ছায়া বড় হচ্ছে। ঠাণ্ডা বাতাসের বেগ বাড়ছে।

আরজ আলী ধীরে ধীরে ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হন। পেছনে ঘরের ভেতর মাথা নিচু করে মুখে আঁচল চাপা দিয়ে তাঁর স্ত্রী অস্ফুট স্বরে কাঁদতে থাকেন। শুকনা পাতার উপর ঠাণ্ডা বাতাস এসে যেমন শব্দ তোলে সে রকম শব্দ হয়।

বইটির চল্লিশ পৃষ্ঠায় শিরোনাম 'মৃতদেহ দানপত্র' গ্রহীতা বাংলাদেশ সরকারের পক্ষে বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজের মাননীয় অধ্যক্ষ, দাতা-আরজ আলী মাতুব্বর, পিতা- এন্তাজ আলী মাতুব্বর, সাকিন- লামচরি, থানা- কোতয়ালী, জিলা- বরিশাল, জাতি- মুসলমান, পেশা- হালচাষ।

কস্য মৃতদেহ দান পত্রমিদং কার্য্যঞ্চেদং আমি মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পর আমার মৃতদেহটি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজকে দান করলাম। কলেজ কর্তৃপক্ষ আমার মৃতদেহটি দ্বারা উক্ত কলেজের উন্নয়ন ও সমাজকল্যাণমূলক যে কোন কাজ করিতে পারিবেন। আমার মৃত্যুর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ওয়ারীসগণ আমার মৃতদেহটি কলেজ কর্তৃপক্ষের নিকট পৌছাইয়া দিবে। কিন্তু কোন কারণে যদি এমন কোন স্থানে আমার মৃত্যু ঘটে যাহাতে আমার ওয়ারীসগণের আয়ত্তে না থাকে, তবে তাহারা আমার মৃত্যুর সঠিক তারিখ নির্দিষ্ট স্থানের নাম অবিলম্বে কলেজ কর্তৃপক্ষকে জ্ঞাত করাইবে। কলেজ কর্তৃপক্ষ ইচ্ছা করিলে এবং সম্ভব হইলে তাহাদের দায়িত্বে কলেজের কাজে ব্যবহারের জন্য আমার মৃতদেহটি আনাইয়া লইতে পারিবেন। তাহাতে আমার ওয়ারীসদের কোন আপত্তি থাকিবে না। প্রকাশ থাকে যে চক্ষুদ্বয় চক্ষু ব্যাঙ্কে দান করা বাঞ্ছনীয়। এতদার্থে আমি সরল মনে, সুস্থ শরীরে, স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে অত্র দান-পত্র দলিল লিখিয়া সম্পাদন করিয় দিলাম। ইতি সন ১৩৮৮ অগ্রহায়ণ, তাং ইং ০৫/১২/৮১। স্বাক্ষর আরজ আলী মাতুব্বর লেখকসহ ইত্যাদি ৪ জন।

হাসনাত বই থেকে মুখ তুলে বলল, সত্যি বিজ্ঞানের সেবায় নিবেদিত প্রাণ একজন মানুষ ছিলেন মাতুব্বর। জীবনে যেমন, মৃত্যুর পরও তাই। এমন ঘটনা বোধ হয় এদেশে এই প্রথম। চক্ষুদান অবশ্য কেউ কেউ করেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ মৃতদেহ দান, আমি শুনিনি আগে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আলী নুর বললেন, বেশ সাড়া পড়ে গিয়েছিল সংবাদটি প্রকাশের পর। দৈনিক ইত্তেফাক 'মানব কল্যাণে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত' নামে বড় সংবাদ ছাপা হয়েছিল। মানবকল্যাণ ছাড়া আরো একটি কারণের কথা অবশ্য উল্লেখ করতে হয়।

কী? হাসনাত তাকায় তাঁর দিকে।

'স্মরণিকা' বইটির শেষে লেখা আছে।

আমাকে দিন। বার করে দিচ্ছি। আলী নুর বইটি হাতে নিয়ে পাতা উল্টায়ে নিে বললেন, হ্যাঁ, এই যে। নিন।

হাসনাত পড়তে থাকল, "মেডিকেলে আমার দেহদানের কারণ মায়ের বিদেহী আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন এবং আমার মরদেহটির দ্বারা মানব কল্যাণের সম্ভাবনা বিধানে আমার সজীব মনের পরিতোষ ও আনন্দ লাভের প্রয়াস মাত্র। আমার মরদেহটির সাহায্যে মেডিকেল কলেজের শল্যবিদ্যা শিক্ষার্থীগণ শল্যবিদ্যা আয়ত্ত করবে, আবার তাদের সাহায্যে রুগ্‌ণ মানুষ রোগমুক্ত হয়ে শান্তিলাভ করবে। আর এসব প্রত্যক্ষ অনুভূতিই আমাকে দিয়েছে মেডিকেলে মরদেহ দানের মাধ্যমে মানব কল্যাণের আনন্দলাভের প্রেরণা। এতে আমার পরিজনের বা অন্য কারো উদ্বিগ্ন হওয়া সমীচীন নয়"।

হাসনাত মুখ তুলে বলল, শেষের কথাটি লিখেছেন কেন?

এ তো খুব স্বাভাবিক যে সেন্টিমেন্ট বা ধর্মানুভূতির জন্য সন্তান-সন্ততি, আত্মীয়বর্গ কখনো চাইবে না মৃত্যুর পর এইভাবে শব ব্যবচ্ছেদ হোক। অন্যেরা আপত্তি তুলবে প্রচলিত আচার অনুষ্ঠানের খেলাপী বলে।

আপত্তি তুলেছিল কেউ? হাসনাত তাকায়।

তুললেও প্রবল ছিল না নিশ্চয়ই। না হলে তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সবকিছু হতে পারত না। অবশ্য আপত্তি শোনার মতন মানুষ ছিলেন না তিনি। তাঁর লেখা অছিয়তনামা পড়ে দেখুন। খুব দৃঢ়-সংকল্প মানুষ ছিলেন। খুব ভেবে চিন্তে, ধীরে স্থিরে কাজ করে গিয়েছেন আমৃত্যু।

আইয়ুব বলল, তাঁর গ্রামের লোক আপত্তি না করলেও বরিশাল শহরের কিছু লোকজন মৃতদেহ মেডিকেল কলেজে দেবার সময় বেশ বিরোধিতা করেছেন। হৈ চৈ হয়েছিল।

নূর বললেন, হ্যাঁ, মনে পড়ছে এখন। অ্যাডভোকেট কাইয়ুম সাহেবও বলেছেন সে কথা।

হাসনাত বলল, মেডিকেল কলেজে তাঁর মৃতদেহ উৎসর্গ করা কি কেবলই বিজ্ঞানের সাধনায় তার সামান্য অবদান রাখার জন্য?

নূর ভাবলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন তাঁর মনের কথা কেউ জানে না। তবু অনুমানই করতে পারি আমরা। একটা অনুমান এই যে মায়ের মৃতদেহ দাফন নিয়ে মৌলভী সাহেবরা যে অসহযোগিতা করেছিলেন তিনি বোধকরি সেটা আজীবন ভুলতে পারেননি। পরে এইভাবে মৃত্যুর পর মৃতদেহ দাফন করতে না দিয়ে তিনি মৌলবাদীদের উপর প্রতিশোধ চেয়েছেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

আইয়ুব বলল, হ্যাঁ এটাই সত্য মনে করা যেতে পারে। শুধু ধর্মীয় রীতি অনুযায়ী সে দাফন হতে দিলেন না তাই নয়; সে বিজ্ঞানের সঙ্গে ধর্মের একটা সরাসরি বিরোধ গড়ে তুলেছে। ধর্মান্ধ ব্যক্তিরা সেই বিজ্ঞানের উপরে, তবে তাঁর আনুসক্য দেখিয়ে আরজ আলী আরো এক ধরনের প্রতিশোধ নিয়েছেন বলা যায়।

হাসনাত বলল, কেবল জেদী নয়। খুব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ ছিলেন। যা করতেন সুপরিকল্পিত উপায়েই করতেন দেখা যাচ্ছে।

নূর বলল, খুব গোছালো মানুষ। সংসার ধর্মও করেছেন, আবার নিজের পথও অনুসরণ করেছেন দৃঢ় চিত্তে।

হাসনাত বলল, লেখাপড়া শিখলে আরো অনেক কিছু দিয়ে যেতে পারতেন সমাজকে। কি বলেন?

আলী নুর চিন্তা করলেন, তারপর বললেন, বলা কঠিন। অনেকভাবে পড়াশুনা করলে হয়তো পরে পাঁচ জনের মতো চাকরি করতেন। বস্তুবাদী হয়ে ঘর-সংসারই করে যেতেন। এমন কি হয়তো ধর্মেকর্মে মন দিয়ে পরকালের জন্য উদ্বিগ্নও হয়ে উঠতেন। শিক্ষিত মধ্যবিত্ত সমাজের মানুষের যা ললাট লিখন। হয়তো তেমনি হতো তাঁর পরিণতি।

আইয়ুব বলল, হয়তো। কিন্তু গড্ডালিকা প্রবাহে গা ঢেলে দিতেন তিনি এটা ভাবতে কষ্ট হয়। লেখাপড়া শিখেছে অথচ সমাজ সংস্কারক, একটুবা বিপ্লবী চিন্তাবিদ এমন ব্যক্তির কি দৃষ্টান্ত নেই এ দেশে। নূর বললেন, আছে। তবে তাঁর মধ্যবিত্ত সমাজেরই প্রতিনিধি। নিম্নবিত্ত থেকে মধ্যবিত্তে এলে মধ্যবিত্তের মানুষদের লোভ লালসা, আশা আকাঙ্ক্ষাই বড় হয়ে আসে পরে উঠে আসা নিম্নবিত্তের মানুষদের।

আইয়ুব বলল, ব্যতিক্রম। ব্যতিক্রম বলে কিছু থেকেই যায়। আমি ভাবতে পারি না আরজ আলী মাতুব্বর শিক্ষিত হয়ে কর্মজীবনে প্রবেশ করলে তাঁর স্বাতন্ত্র্যবোধ থাকত না, অথবা জীবন বিজ্ঞান নিয়ে তিনি তাড়িত হতেন না।

হাসনাত এমন ঘূর্ণয়নে বলল তাকে কি কিছুটা স্বার্থপর বলা যায়?

কেমন? দুজনেই চোখ তুলে তাকালো তাঁর দিকে।

এই যে নিজে পড়াশুনা নিয়ে এত ব্যস্ত থাকতেন অথচ নিজের ছেলেমেয়েদের পড়াশুনায় তেমন নজর দিলেন না। অর্থাভাবে তিনি যা পারেননি, ছেলেমেয়েদের দিয়ে সেই অচরিতার্থ বাসনা পূরণ করে নিতে পারতেন।

নূর বললেন, পড়িয়েছেন ছেলেদের। মেয়েদের কথা জানি না। একজন গ্র্যাজুয়েট আর একজন ওভারসিয়ার না সার্ভেয়ার হয়েছে।

হ্যাঁ। উচ্চ শিক্ষায় শিক্ষিত কেউ হয়নি। হয়তো ছেলেরা তার মতো মেধাবী ছিল না। আইয়ুব বলল, হাসনাত ভাই এ বিষয়ে কিছুটা ঠিক। দেখা যায় পণ্ডিত মানুষেরা ছেলেমেয়েদের কিছুটা অবহেলাই করেন। ইচ্ছে করে নয়, সময় পান না বলে।

নূর বললেন, ছেলেদের পড়ায় সুযোগ করে দিয়েছেন এরপর আর কি করতে পারতেন? ছেলেদেরই উচিত ছিল বাবার দৃষ্টান্ত দেখে আরো উৎসাহী হওয়া। আরজ আলীর মতো তাদের তো মাঠে লাঙল চষার পর মাঠে বসে বই খুলে পড়তে হয়নি।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসনাত বলল, যাই হোক, ব্যাপারটা দাঁড়িয়েছে এই যে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর ইনটেলেকচুয়াল ট্রাডিশনকে সামনে নিয়ে যাবার উত্তরাধিকারী কেউ নেই এখন। নুর বললেন, তা হবে কেন? সেই ট্রাডিশনের উত্তরাধিকারী এ দেশের সচেতন মুক্তবুদ্ধির মানুষ। আর সেই জন্যই তাঁকে নিয়ে এখনো এত আগ্রহ।

আইয়ুব বলল, আগ্রহ কেবল বয়স্ক বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে নয়। নতুন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের কাছেও। বইমেলাতে আমি দেখেছি তাঁরা কেমন স্টলে স্টলে গিয়ে আরজ আলীর বই খোঁজে।

নূর বললেন, এই যে আপনি তাঁকে নিয়ে একটা উপন্যাস লিখতে চাইছেন, এও কি সেই উত্তরাধিকার প্রাপ্তির স্বীকৃতির জন্য না?

হাসনাত কিছু বলল না।

নূর বললেন, এই যে আপনি তাঁকে চোখে দেখেননি, তাঁর বইও এই কিছুদিন আগেও পড়েননি। শুধুই নাটক দেখে আমার মুখের কথা শুনে।

হাসনাত মাথা নেড়ে বলল, হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন। তাঁর প্রভাব কেউ অস্বীকার করতে পারে না। যারা তাঁর সঙ্গে একমত নন তাঁরাও তাঁকে স্বীকার করে নিয়েই সমালোচনা শুরু করেন। তিনি তাচ্ছিল্যের পাত্র নন। হেসে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

AMARBOI.COM

অছিয়তনামা।

রেং তাং দলিল নং

লিখিতাং আরজ আলী মাতুব্বর, পিতা মৃত- এন্তাজ আলী মাতুব্বর, সাং- লামচরি, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- বরিশাল, জাতি- মুসলমান, পেশা- হালুটি।

কস্য অছিয়তনামা পত্রমিদং কার্য্যঞ্চাগে (১) আবদুল মালেক মাতুব্বর (পুত্র) (২) আবদুল খালেক মাতুব্বর (পুত্র) (৩) আবদুল বারেক মাতুব্বর (পুত্র) (৪) মোসাম্মত ফয়জরন নেসা (কন্যা) (৫) মোসাম্মত নুর জাহান বেগম (কন্যা) (৬) মোসাম্মত মনোয়ারা বেগম (কন্যা) (৭) মোসাম্মত বিয়াম্মা বেগম (কন্যা) (৮) মোসাম্মত সুফিয়া খাতুন (স্ত্রী), সাকিন- লামচরি, থানা- কোতোয়ালী, জেলা- বরিশাল, জাতি- মুসলমান, পেশা- হালুটি। এতদ্বারা তোমাদিগকে অছিয়ত করা যাইতেছে যে, তোমরা আমার উত্তরাধিকারী বটে। আমার স্থাবর অস্থাবর যাবতীয় সম্পত্তির ন্যায় আমার মৃতদেহটিরও উত্তরাধিকারী তোমরাই। তোমরা জান যে, মানবকল্যাণের উদ্দেশ্যে আমার মৃতদেহটি বরিশাল শেরে বাংলা মেডিকেল কলেজে দান করিয়াছি, তাই আমার মৃত্যুর পর তোমাদের এই বিষয় ও অন্যান্য বিষয় কর্তব্য সম্বন্ধে লিখিত অছিয়ত করিয়া যাইতেছি। আমি আশা করি যে তোমরা আমার অছিয়তসমূহ পালন করিবা, কিন্তু যদি আমি এমন কোন স্থানে মারা যাই যাহাতে আমার মৃতদেহ তোমাদের আওতাধীনে না থাকে, তবে সেই ক্ষেত্রে আমার এই বিষয়ের অছিয়ত পালনের কোন দায়িত্ব তোমাদের থাকিবে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অছিয়তসমূহ :

১। মৃত্যুর পর আমার শবদেহটি জলে ধৌতপূর্বক পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করিয়া (নতুন বা পুরাতন) বস্ত্রাবৃত করিবা। হয়তো খোশবু ব্যবহার করিবা ইহা ছাড়া অন্য কোনরূপ চিরাচরিত প্রথা রক্ষার জন্য উদ্বিগ্ন হইবা না।

২। আমার বিদেহী আত্মার কল্যাণের উদ্দেশ্যে প্রার্থনা করার জন্য কাহাকেও পীড়াপীড়ি বা সেই জন্য অর্থ ব্যয় করিবা না। তবে কাহারও স্বেচ্ছাকৃত প্রার্থনা বা আশীর্বাদ আমার অবাঞ্ছিত নহে।

৩। মেডিকেল কলেজের কর্তৃপক্ষের কাছে সোপর্দ করিবার পূর্বে তোমাদের সুবিধামতো সময়ে আমার মৃতদেহটির ফটো তুলিবা এবং তাহার কপি এনলার্জ ও বাঁধাই করিয়া আমার লাইব্রেরি ভবনে রাখিবা।

৪। মৃত্যুর পর বরিশাল মেডিকেল কলেজে আমার শবদেহটি পৌঁছাইবার ও অন্যান্য খরচ নির্বাহের উদ্দেশ্যে আমি বরিশাল জনতা ব্যাংক (চকবাজার শাখা, একাউন্ট নাম্বার ৩৭৭২ তাং ১৯/০৯/৮০)- এ একটি সেভিংস একাউন্ট ফান্ড করিয়াছি এবং এতদুদ্দেশ্যে সেই ফান্ডে অন্যূন ৫০০ টাকা সতত মজুত থাকিবে। আমার মৃতদেহটি লইয়া তোমাদের মেডিকেল কলেজে যাতায়াত খরচ ও ফটো তোলা ইত্যাদি যাবতীয় খরচ তোমরা সেই ফান্ড হইতে বহন করিতে পারিবে।

আমার মৃত্যু দিনটির স্মৃতি রক্ষার উদ্দেশ্যে মৃত্যুর পরবর্তী বছরগুলিতে আমার মৃত্যু দিবস পালনের জন্য আমি বার্ষিক ১০০ টাকা করিয়া ব্যয় বরাদ্দ করিয়া যাইতেছি এবং তাহা বহন করিতে হইবে লাইব্রেরির সাধারণ তহবিলের টাকা হইতে, কিন্তু আমার সদ্য মৃত্যু দিনটিতে মং ১০০ টাকা দান করিতে হইবে উপরোক্ত সেভিংস ফান্ড হইতে।

৫। উপরোক্ত যাবতীয় খরচ বহনের পর যদি আমার সেভিংস একাউন্টে অর্থ মওজুত থাকে তবে তাহা হইতে তোমাদের মধ্যে যেই যেই ব্যক্তি মেডিকেলে আমার দেহদান ব্যাপারে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করিবা, সেই ব্যক্তি তাহাদের পারিশ্রমিক বাবদ মোট মং ৫০ টাকা গ্রহণ করিতে পারিবা।

৬। প্রতি বছর আমার মৃত্যানুষ্ঠান দিনটির পূর্বে লাইব্রেরির নির্বাহী কমিটির স্থানীয় সদস্যদের মধ্যে যে-কোন তিনজনের পরামর্শ লইয়া আমার নিকটতম প্রতিবেশী কাঙ্গাল হইতে ক্রমশ দূরবর্তী ২০ জন কাঙ্গাল-কাঙ্গালীকে মনোনীত ও আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের প্রত্যেককে ৫ টাকা করিয়া (মোট ১০০ টাকা) সাহায্যদান করিতে হইবে। তবে সেভিংস একাউন্টের টাকার দ্বারা তহবিল বৃদ্ধি পাইলে তদ্বারা কাঙ্গাল-কাঙ্গালীর সংখ্যা বাড়াইতে পারা যাইবে।

৭। তোমরা আমার (পুত্রগণ) লাইব্রেরিতে রক্ষিত ১৩/ক/৫ নং খাতাটির (বংশাবলী) বা (বংশলতা নামীয়) অনুকরণে আমার উর্ধ্বতন পুরুষ হইতে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তোমাদের নিজ নিজ 'বংশাবলীর' বা 'বংশলতা' লিখিয়া রাখিবা এবং তোমাদের অধস্তন পুরুষগণকে পুরুষানুক্রমে তাহাদের নিজ নিজ বংশাবলী বা 'বংশলতা' লিখিয়া রাখিতে উপদেশ দিয়া যাইবা।

প্রকাশ থাকে যে আমার বংশাবলীর মধ্যে যেই ব্যক্তি আমার অছিয়তের বাক্য পালন করিবে না সেই ব্যক্তি আমার ত্যাজ্য। স্থাবরাস্থাবর কোন সম্পত্তির 'উত্তরাধিকারী' বলিয়া দাবি করিতে পারিবে না। দাবি করিলে তাহা সর্বাদালতে বাতিল হইবে।

এতদ্বারা আমি সরল মনে সুস্থ শরীরে স্বজ্ঞানে অত্র অছিয়তনামা সম্পাদন করিয়া দিলাম। ইতি, সন ১৩৮৮ সালের ১৯শে অগ্রহায়ণ ইং ০৫/১২/৮১

স্বাক্ষর : আরজ আলী মাতুব্বর।

হাসনাত মুখ তুলে বলল, খুব ঠাণ্ডা মাথার মানুষ। আর ঐ যে বললেন দৃঢ় সংকল্প, তাই। কিন্তু এ কি এক ধরনের শক্তি প্রয়োগ নয়? ওয়ারিশদের কিছু বলার সুযোগ নেই।

ছিল। যদি সম্পত্তির উপর দাবি প্রত্যাহার করত কেউ তাহলে ঐ অছিয়তনামার দায়-দায়িত্ব তার থাকত না।

হাসনাত বলল, সম্পত্তির উপর দাবি কেউ ছাড়ে?

আলী নূর, সম্পত্তির ব্যাপারে একটা বিষয় আপনার জানা দরকার।

বলুন।

ষাট বছর পার হবার পর তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে এরপর যত আয় করবেন সে সব দিয়ে ট্রাস্ট ফাণ্ড করে দেবেন। তার উপর ওয়ারিশানদের কোনো দাবি থাকবে না। যুক্তিটা ছিল এ রকম, একজন মানুষ ষাট বছর পর্যন্তই উপার্জন করে, চাকরি করে তারপর অবসর নেয়। সুতরাং তিনিও তাই করবেন।

সত্যি সত্যি অবসর নিয়েছিলেন নাকি? পঁচিশ বছর অবসর জীবন যাপন করেছেন তাহলে?

না সেই অর্থে অবসর নেননি। ষাট বছরের পরও বিভিন্ন রকমের কাজ করেছেন, যেমন জমি জরিপের কাজ, বরিশালে বলে কালি করা। সেই উপার্জন দিয়ে জমি কিনেছেন, পরে বিক্রি করে সেই টাকায় ট্রাস্ট ফাণ্ড করেছেন। লাইব্রেরি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। গরিব ছাত্রদের বৃত্তি দেয়া হচ্ছে ট্রাস্ট ফাণ্ড থেকে। ষাট বছরের পরের উপার্জনে তার ওয়ারিশদের কোনো দাবি রাখতে দেননি।

হাসনাত প্রায় অবিশ্বাসের ভঙ্গিতে বলল, দারুণ পরিকল্পিত জীবন! দৃঢ় সংকল্প তো বটেই। দেখা যাচ্ছে জীবনে যা করতে চেয়েছিল তাই করতে পেরেছেন। সত্যিই অসাধারণ।

আলী নুর বললেন, এ ম্যান উইথ এ মিশন বলতে যা বোঝায়।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

হাসনাত বলল, যা সবচেয়ে আশ্চর্যের তা হলো যে পরিবেশে জন্মেছেন, বড় হয়েছেন সেখানে এমন ধীরস্থির আর সুনিশ্চিতভাবে গন্তব্যে পৌঁছানো অসম্ভব না হলেও কষ্টকর ছিল।

আরজ আলী মাতুব্বর পেরেছিলেন। সেটাই তাঁর সবচেয়ে বড় উত্তরাধিকার। আমাদের সবার জন্য।

আলী নুর হাসিমুখে তাকালেন।

নদীর বাঁকটা পেরুতেই ছবির মতো পুরনো পাম গাছ, গাছগাছালী আর লাল সাদা বাড়িগুলো হঠাৎ হাসিমুখে নদী তীরে এসে দাঁড়ায়। স্টিমার এগুতে থাকে ধীর গতিতে। কয়েকবার 'ভো' দেয়। ঘাটে লঞ্চ, স্টিমার, বড় বড় নৌকার জটলা। এই ভোরেও মানুষের ভিড়।

স্টিমার না ভিড়তেই হুড়মুড় করে কুলিরা ধেয়ে এল। দুবদাব শব্দে উঠে এল উপরে। তাদের নজর ফার্স্ট ক্লাস, সেকেন্ড ক্লাসের দিকে। বচসা শুরু করে দিল নিজেদের মধ্যেই।

আইয়ুব হোসেনের হাতে ছোট একটা ব্যাগ। দুদিনের জন্য এসেছে সে। তাই বেশি কিছু আনেনি। সেই ব্যাগ নিয়ে টানাটানি শুরু করে দিল কুলি কয়েকজন। সে ব্যাগটা হাতে তুলে নিয়ে বলল, লাগবে না। দেখছ না ছোট ব্যাগ। খুব ভারীও নয়।

ঘাটে নেমে রিকশা নিল সে। বন্দরের কাছে একটা হোটেলের ঠিকানা জানা ছিল। সেখানে পৌঁছে দেখল বয়-বেয়ারা সবেমাত্র ঘুম থেকে উঠেছে। কেউ চোখ কচলাচ্ছে, কেউ বাথরুমে যাচ্ছে।

ঘরে ঢুকে বিছানায় শুতে না শুতে সারারাতের ক্লান্তিতে ঘুম এল তাঁর। স্টিমার জার্নিতে তার কখনো ঘুম হয় না। কানে নদীর শব্দ বাজে। দশটার দিকে বের হলো আইয়ুব। বি এম কলেজে গিয়ে জানা গেল কাজী গোলাম কাদির তিন বছর আগে মারা গিয়েছেন। অধ্যাপক শামসুল হক, সরফুদ্দিন হাই সবাই ঢাকায় এখন। আলী নুর সাহেবও ঢাকায়। তার সঙ্গে দেখা করেছে কয়েকবার।

আল-আমীন প্রেসের কেউ কেউ স্মরণ করতে পারল আরজ আলী মাতুব্বরকে। একজন বলল, খুব পড়াশুনা করতেন। বই লিখতেন। গ্রামে বড় লাইব্রেরি করে দিয়ে গিয়েছেন।

ডিসি সাহেবের সঙ্গে দেখা করা গেল না। তিনি ট্যুরে গিয়েছেন। তাঁর সঙ্গে দেখা হলে আরজ মঞ্জিল লাইব্রেরি ট্রাস্ট সম্বন্ধে কিছু প্রশ্ন করার ইচ্ছে ছিল আইয়ুবের। ডিসি সাহেবই পদাধিকার বলে কমিটির চেয়ারম্যান।

এখন খুব তাড়াতাড়ি লামচরি গ্রামে যাওয়া যায়। আরজ আলী মাতুব্বর সারাজীবন পায়ে হেঁটে আসা-যাওয়া করেছেন এগারো কিলোমিটার পথ।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শহরের কাছেই গ্রাম, তাই জনবসতি বাড়ছে আরজ আলী মাতুব্বরের পিতামহ যিনি জল-জঙ্গল পরিষ্কার করে এই গ্রামের পত্তন করেন, তিনি আজ দেখলে কিছুই চিনতে পারবেন না। টিনের ঘর, পাকা দালান, মসজিদ, মক্তব, স্কুল, মাদ্রাসা আর আরজ মঞ্জিল লাইব্রেরি লামচরি গ্রামকে পেছনে পড়ে থাকতে দেয়নি।

কাছে যেতেই কয়েকজন এগিয়ে এল। আরজ আলী মাতুব্বরের নাম বলতেই কয়েকজন এগিয়ে এল। আরজ আলী মাতুব্বরের নাম বলতে আইয়ুবকে ভালো করে দেখে নিয়ে বলল, খবরের কাগজের লোক?

আইয়ুব দ্ব্যর্থবোধকভাবে মাথা নাড়ালো।

তারা বলল, আসুন।

কবরটা পাকা। বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। চারদিকে গাছ-সবুজ ঘাস। বেশ স্নিগ্ধ মনোরম পরিবেশ।

"আমার সমাধির বিশেষ কোন বৈশিষ্ট্য নেই। মাত্র সমতল স্ল্যাবের উপর আর একখানা চৌচালা স্ল্যাব এবং তদুপরি স্ল্যাবটি নাড়াচাড়া ও নামফলক স্থাপনের জন্য একটি বাঁকানো রড বসানো হয়েছে। কিন্তু একটি গুজব ছড়ায় এই বলে যে, আমার সমাধিটিতে গ্লাস এবং টেলিফোন বসানো হয়েছে। তখন আমি যেখানেই যেতাম, লোকে আমাকে জিজ্ঞাসা করত সেই কথাই। আমি তো হতবাক। কৌতূহলী জনগণকে আমি বুঝাতে পারলাম না যে ওগুলো মিথ্যে গুজব। সে মিথ্যে গুজবের উপর ভিত্তি করে অসংখ্য লোকের সমাগম হতে লাগল আমার সাদামাটা সমাধিটি স্বচক্ষে দেখার জন্য। প্রত্যক্ষদর্শীদের সাক্ষ্য-প্রমাণের বদৌলতে দর্শকদের সমাগম বর্তমানে কমেছে। তবে দূরাঞ্চল থেকে কিছু কিছু লোক এখনো এসে থাকে আমার সমাধি দর্শনে।"

আইয়ুব পাশের লোকটিকে বলল, লোকজন আসে কবর দেখতে?

লোকটি হেসে বলল, কবর কোথায় দেখছেন? এর মধ্যে কোনো লাশ ছিল না। শুধু একটা বয়াম আছে। তার মধ্যে মাতুব্বরের কয়েকটা দাঁত, চুল, দাড়ির চুল আর আর একটা নখ।

আইয়ুব বলল, সে কথা জানি। এটা দেখতে লোক আসে কিনা জানতে চেয়েছি।

আসে মাঝে মাঝে। বাইরের লোকই। যেমুন আপনি আইছেন।

৩ পৌষ, ১৩৮৬ সালে আরজ আলী মাতুব্বরের ৮০ বছর পূর্ণ হলো। এই দিনেই তিনি আগের পরিকল্পনা অনুযায়ী তাঁর স্মৃতি সংরক্ষণের জন্য সমাধি নির্মাণ শুরু করেন। সমাধির নিচের দিকে পাকা করতে রাজী হলো না রাজমিস্ত্রীরা। গ্রামের মরুব্বিরা শরিয়ত বিরোধী বলে সে কাজ করতে নিষেধ করে মিস্ত্রিদের। অগত্যা সে কাজটি নিজ হাতেই শেষ করলেন আরজ আলী মাতুব্বর। সমাধির নিচের দিকটা সিমেন্ট দিয়ে পাকা করে দিলেন। তারপর একদিন চুল দাঁত ও নখ রাখা বয়ামটি রাখা হলো সমাধির ভেতর।

গ্রামের লোক খুব অবাক হয়েছিল। সমালোচনাও হয়েছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

তারপরও শেষ করতে পেরেছিলেন? আইয়ুব তাকায় পাশের লোকটির দিকে।

হ্যাঁ। সে তো দেখতেই পাচ্ছেন। লোকে বুঝতো তাকে ঠেকানো যাবে না। খুব জেদী মানুষ ছিলেন।

কেউ ভেঙে দিতে আসেনি?

নাহ্। ভাঙবে কেন? নিজের উপর তৈরি করা জিনিস, অন্যে আসবে কেন ভাঙতে!

আইয়ুব ঘুরে দাঁড়ালো, পাশেই গাছপালার পাশে আরজ মঞ্জিল লাইব্রেরি। দরজা, জানালা খোলা। ভেতরে লোক, দূর থেকেই আলমারিতে বইপত্র সাজানো দেখা গেলো। গাছে পাখি ডাকছে। সুন্দর বাতাস বইছে।

তাঁর বিদ্রোহটা ছিল এত নম্র আর বিনয়ের সঙ্গে যে তাঁর বড় শত্রু ছিল না। নিজ গ্রামে তাকে নিগৃহী হতে হয়নি তেমন নির্মমভাবে। এটাও তাঁর একটা বড় সাফল্য। ব্যতিক্রমী হয়েও তিনি বিতাড়িত হননি, স্বেচ্ছা কিংবা অনিচ্ছাকৃত নির্বাসনে যেতে হয়নি।

আলী নুর তাকালো দুজনের দিকে।

আইয়ুব বলল, সে কথা মাতুব্বরও উপলব্ধি করতেন। আর এ জন্য গ্রামবাসীদের প্রতি ছিল তাঁর কৃতজ্ঞতাবোধ আর শ্রদ্ধা। লাইব্রেরি উদ্বোধনের সময় বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন, সবাইকে আমি ধন্যবাদ জানাই এই জন্য যে আপনাদের গ্রাম সমাজের একজন আনাড়ি মানুষ আমি। কেননা প্রচলিত সমাজে বিধির বাইরে অনেক কাজ করে যাচ্ছি। আর এ জন্য আপনারা আমাকে সমাজচ্যুত করতে পারতেন, আমাকে পারতেন একঘরে করে বর্জন করতে। কিন্তু তা আপনারা করেননি। এবং আমাকে সাথে নিয়েই কাজ করেছেন! মর্যাদা দান করেছেন।

আলী নুর বললেন, আমি এই দিকটা চিন্তা করে দেখিনি। আইয়ুব ঠিকই বলছে, গ্রামবাসীর সমর্থন না পেলেও তারা যে তাঁকে সহ্য করে গিয়েছে এটাও বড় কথা। এর জন্য অবশ্যই তার চারিত্রিক গুণাবলী দায়ী। তিনি যদি রাগী হতেন, উচ্চকিত স্বরে কথা বলতেন, লোকজনকে ক্ষেপিয়ে দেবার জন্য কার্যকলাপ শুরু করতেন তাহলে এটা হতো না।

হাসনাত বলল, তার মধ্যে কখনোই কোনো উগ্রতা দেখেনি? কিছুতেই রেগে যেতেন না?

রাগতেন না, তিনি হয়তো ক্ষুব্ধ হতেন। কিন্তু তার কোনো বহিঃপ্রকাশ ছিল না। তাঁর কথা মনে হলেই চোখে ভাসে প্রশান্ত স্মিত হাসি। যেন জীবনের কোনো হতাশা, ব্যর্থতা, জ্বালা, যন্ত্রণা ছিল না।

হাসনাত বলল, আমার দুর্ভাগ্য তাঁকে দেখতে পেলাম না।

দেখলে হয়তো লিখতে না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

কেন? হাসনাত তাকালো তাঁর দিকে।

পরিচিতজনদের নিয়ে কি আমরা লিখব? আইয়ুবের মুখে হাসি।

আলী নুর বললেন, ব্যতিক্রম বলে একটা কথা আছে না? পরিচয় হলে হাসনাত ভাই হয়তো আরো আগেই লিখতে চাইতেন।

হাসনাত অন্যমনস্কের মতো বলল, কি জানি।

শুক্রবার সকাল এগারটায় আলী নুরের লালমাটিয়ার বাড়িতে গিয়ে হাসনাত শুনল তিনি এখন ঘুমুচ্ছেন। তাঁর স্ত্রী জানালেন যে তিনি সকালে যথারীতি উঠেছেন এবং কিছুক্ষণ আগে আবার ঘুমোতে গিয়েছেন।

এটা আমার অনেকদিনের অভ্যাস। বিছানা থেকে উঠে চা-নাস্তা খেয়ে আবার না ঘুমোতে গেলে শুক্রবারের সঙ্গে অন্যদিনগুলোর তফাৎ খুঁজে পাই না। বলতে বলতে ঘরে ঢুকলেন আলী নূর। তাঁর স্ত্রী গম্ভীর মুখে হাসনাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, যার সংসারে এত সমস্যা সে কি করে এত ঘুমায় বলেন তো?

আলী নুর হেসে বললেন, সমস্যা আছে বলেই তো বেশি করে ঘুমোনো দরকার। তারপর সিগারেট ধরিয়ে বললেন, কোন সংসারে সমস্যা নেই? এসব বড় করে দেখলে চলবে কেন? জীবনযাপনের আনন্দই তাহলে মাটি।

হাসনাত তাঁর দিকে তাকিয়ে বলল, সাভারে যাবেন নাকি?

জাহাঙ্গীরনগর ইউনিভার্সিতে। অধ্যাপক মুহম্মদ শামসুল হকের বাসায়।

বাইরের দেয়ালে হলুদ রোদ দেখে নিয়ে আলী নুর উৎসাহের সঙ্গে বললেন, চলুন। চমৎকার আজকের সকাল। শীতের আমেজ এখনো লেগে আছে। কী নরম রোদ! এমন দিনেই বেরিয়ে পড়তে হয়।

গাড়িতে উঠে বললেন, শামসুল হক সাহেবদের বাড়িতে অনেক দিন যাই না। মাঝে মাঝে ফোনে কথা হয়। শেষ দেখেছি বছর তিনেক আগে। মাতুব্বর সাহেব মারা যাবার পর।

হাসনাত পাশে বসতে বসতে বলল, বলেন কি? এত ঘনিষ্ঠ ছিলেন আর এখন এত দূরত্ব?

একটা শ্বাস ফেলে আলী নুর বললেন, এই হয়। সময় বড় নির্মম। তার পাওনা ঠিকই বুঝে নেয়।

দরজা খুলে ভেতরে ঢুকতেই শামসুল হক দুহাত দিয়ে আলী নূরকে জড়িয়ে ধরলেন। স্ত্রীকে ডেকে বললেন, এই দেখে যাও, নুর ভাই এসেছেন। তারপর সোফায় বসতে বসতে বললেন, আহা! কতদিন পরে দেখা!

শামসুল হক হাসনাতের দিকে তাকালেন তারপর হেসে বললেন, উনি আমাকে রীতিমতো চমকে দিয়েছিলেন সেদিন। বাসায় বসে বসে বই পড়ছি। ছুটির দিনে

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

ক্যাম্পাসে খুব একটা বের হই না। হঠাৎ প্রশাসনিক ভবন থেকে ফোন এল যে তিনি ঢাকা থেকে আসছেন। আমার সঙ্গে দেখা করবেন। শুনে তো আমি বেশ দুশ্চিন্তায় পড়লাম। আমার সঙ্গে দেখা করতে ওনার মতো একজন কেন ঢাকা থেকে আসছেন? এখন তো মোটামুটি বাণপ্রস্থে আছি। তবু কি কিছু করে ফেলেছি যা মনঃপূত হচ্ছে না কারও? এইসব ভাবতে ভাবতে কনফারেন্স হলে গিয়ে অপেক্ষা করছি। উনি ঘরে ঢুকে আমার সামনে বসেই প্রশ্ন করলেন, আপনি আরজ আলী মাতুব্বরকে চেনেন? বোঝেন অবস্থা। আমার তো সন্দেহ যায় না। মাতুব্বর সাহেবকে নিয়ে কি নতুন করে কিছু শুরু হলো! শেষটায় উদ্দেশ্য খুলে বললেন উনি। শুনলাম আপনিই রেফারেন্স দিয়েছেন।

আলী নুর হেসে বললেন, আপনার মতো মাতুব্বর সাহেব সম্বন্ধে এখন কে আর এত জানে?

শামসুল হক একটু ভেবে বললেন, তাঁর লেখা সম্বন্ধে আমরা জানি, কিন্তু তাঁর চিন্তাধারার সব কি বুঝতে পেরেছি আমরা? নাহ্! আমার তো সব সময় মনে হয়েছে তিনি সব খুলে বলছেন না। কিছু যেন নিজের মধ্যেই রেখে দিয়েছেন।

আলী নুর বললেন, সত্য সন্ধানী মানুষরা এমনই করে। সবকিছু জানতে পেরেছেন বলে নিজেদের ওপরই বিশ্বাস নেই। যতই জ্ঞানার্জন করেছেন ততই অজ্ঞতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছেন। নিউটনের সে উক্তি তো মনেই আছে।

হ্যাঁ। ঠিকই বলেছেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা আর আলোচনায় মাতুব্বরকে কখনো সবজান্তা হয়ে কথা বলতে দেখিনি। 'সত্যের সন্ধান' বইটির মূল সুর, প্রশ্ন করে যেতে হবে। প্রশ্নের ভেতর দিয়েই উত্তর করে জীবন ও জগৎকে বুঝতে হবে। কিন্তু তাঁর এই ওয়ার্ল্ড ভিউ কি লোকে ভুলে যাচ্ছে না? এই আমরা যারা চিনতাম তাঁরা ছাড়া কিছুদিন পর কেউ কি মনে করবে তাঁকে? এই রাজধানীতে? অন্য কোথাও?

কেন করবে না? তাঁর লেখাই তাঁকে মনে করিয়ে দেবে। এই যে হাসনাত ভাই লিখতে শুরু করেছেন এর পেছনে তো তাঁর লেখাই। শুধু যদি তিনি খুব সংগ্রামী মানুষ হতেন, কেবল পড়াশুনা করে নিজে নিজে আনন্দ পেতেন তাহলে তাঁর উত্তরাধিকার কিছুই থাকত না। বিষয়-আশয় ছাড়া। কিন্তু তেমন জীবন তো তিনি যাপন করেননি। বন্ড দিয়ে জেল থেকে বেরিয়ে এসেও চুপ করে থাকেননি।

শামসুল হক বললেন, সে তো জানি। কিন্তু তাঁর লেখা বই কি পাওয়া যায় কোথাও? দুর্লভ হয়ে গিয়েছে এখনই। এই যে হাসনাত ভাই সেদিন ঢাকা থেকে ছুটে এলেন সে তো আমার কাছে মাতুব্বরের 'সত্যের সন্ধান' বইটি আছে জানতে পেরেই।

আলী নুর বললেন, আইয়ুব হোসেন নামে একজন তরুণ লেখক মাতুব্বরের জীবনী লিখেছে সম্প্রতি। বাংলা একাডেমী মাতুব্বরের রচনাবলী ছাপার উদ্যোগ নিচ্ছে। মাতুব্বরের মৃত্যুর পরও তাঁকে নিয়ে এই যে কৌতূহল আর আগ্রহ এত তাঁর জীবন দর্শনের জন্যই। সত্যকে জানতে হবে প্রশ্ন করে করে। অন্ধ বিশ্বাস নয় যুক্তিবাদই সত্যকে জানতে সাহায্য করে। এটাই তো তাঁর বক্তব্য ছিল।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শামসুল হক হাসনাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, তিনি মনে করতেন সেই পথেই প্রগতি আসবে। যদি নতুন প্রজন্ম সে কথা বিশ্বাস করে, আগ্রহ নিয়ে তাঁর লেখা পড়ে তাহলে বলতে হবে মৃত্যুর পরও তিনি সফল।

আলী নুর উৎসাহের সঙ্গে বললেন, শুধু দেশে কেন, দেশের বাইরেও কি তাঁকে নিয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়নি, সেই যে ছেলেটি, কি যেন তার নাম? ঐ যে ফজলুল করিম ম্যাজিস্ট্রেটের নাতি?

শামসুল হক বললেন, শফিকুর রহমান। হ্যাঁ, তাঁর কথা বলেছি হাসনাত সাহেবকে। সদরঘাট ফুটপাত থেকে চুরি হয়ে যাওয়া 'সত্যের সন্ধান' বইটি কিনে চিঠি লিখেছিল মাতুব্বর সাহেবকে। ঢাকায় এলে বাসাবোতে তার বাসায় যেতে অনুরোধ করেছিল। বেশ ইতস্তত করে মাতুব্বর সাহেব একদিন তাদের বাড়ি গিয়েছিলেন। দারুণ আতিথেয়তা করেছিল ছেলেটি। খুব বড় ভক্ত হয়ে যায় সে। নিউইয়র্কের আইকনোক্লাস্ট পত্রিকায় মাতুব্বরকে নিয়ে একটা প্রবন্ধ লিখেছিল। আর একটা প্রবন্ধ লিখে আন্তর্জাতিক পুরস্কারও পেয়েছিল। এখন শুনি প্যারিসে বসবাস করছে। গবেষণা করে, লেখে।

আলী নুর বললেন, এই তো দেখেন তাহলে। দেখা বিদেশে মাতুব্বরকে নিয়ে লেখালেখি চলছে এখনো। ভবিষ্যতেও চলবে মনে করা যেতে পারে।

কিন্তু তাঁর বইগুলো প্রকাশিত হওয়া প্রয়োজন। একসঙ্গে রচনাবলী আকারে হলে ভালো হয়।

আলী নুর বললেন, বাংলা একাডেমী তাই করতে যাচ্ছে বলে শোনা যায়। আইয়ুব হোসেন তাই বলল সেদিন।

খুব ভালো হবে। তারা কি তাঁর জন্ম দিন পালন করবে? অথবা বইটির প্রকাশনা উৎসব? শামসুল হক তাকায় আলী নুরের দিকে।

আলী নুর হাসনাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, হাসনাত ভাই বলতে পারবেন; তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছে।

হাসনাত এতক্ষণ দুজনের কথা শুনছিল। এবারে বলল, না তারা বই প্রকাশনা পর্যন্তই থাকতে চায়। অন্যান্য অসুবিধা আছে। যেমন– আরো অনেকের জন্মদিবস তাহলে পালন করতে হবে তাদের। অথবা যত জীবনী গ্রন্থ বেরিয়েছে সবগুলোর প্রকাশনা উৎসব। আইয়ুব হোসেনকে বলুন।

আলী নুর বললেন, আইয়ুব এ ব্যাপারে বেশ কিছুদূর এগিয়েছে। কবি শামসুর রাহমান, ড. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী এঁদের সঙ্গে আলাপ করেছে। তাঁরা স্যুভেনিরের জন্য প্রবন্ধ দেবেন।

শামসুল হক বললেন, সেই প্রকাশনা উৎসবেই একটি স্মৃতি পরিষদ গঠন করা যেতে পারে। বছরে একটা অনুষ্ঠান করা হবে। একটা বক্তৃতামালার আয়োজন করা যেতে পারে।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

অধ্যাপক শামসুল হকের স্ত্রী ঘরে এসে বললেন, খেতে আসুন। পুকুরের মাছ আছে। খুব তাজা। ও আজকেই এনেছে। আলী নুর হেসে বললেন, আমার ক্ষিধে নেই। আর হাসনাত ভাই তো খাবেন না।

আলী নুর বললেন, খাবো আর একদিন। আপনি ভাইকে খাবার দিন। আমরা টেবিলে বসে গল্প করব।

বিকেলে বিদায় নেবার সময় দরজার সামনে দেয়ালের কাছে ইজিচেয়ারটা দেখে আলী নুর কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে তাকিয়ে থাকলেন।

শামসুল হক বললেন, চিনতে পারলেন? বরিশালে আমার বাসায় মাতুব্বর সাহেব ওটাতেই বসতেন। আমরা দুজন বসতাম দুপাশে মোড়া কিংবা চেয়ার নিয়ে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে যেত তাঁর সঙ্গে কথা বলে। ম্যাক্স প্ল্যাঙ্ক, আইনস্টাইনের থিওরি বলে তাক লাগিয়ে দিতেন।

আলী নুর কিছু বললেন না। কিছুক্ষণ কেবল তাকিয়ে থাকলেন। এক সময় সেই ইজিচেয়ারে আরজ আলী মাতুব্বরকে তিনি যেন বসে থাকতে দেখলেন। হাতে 'সত্যের সন্ধান' বই, মুখে স্মিত হাসি আর চোখে উজ্জ্বল দৃষ্টি।

ঐ চোখ দুটি আর একজন মানুষ ব্যবহার করছে, হঠাৎ দেখলে সঙ্গে সঙ্গে সনাক্ত করা যাবে। অমন তীক্ষ্ণ, অন্তর্ভেদী দৃষ্টি সব চোখে থাকে না। ভাবতে ভাবতে আলী নুর অন্যমনস্ক হলেন। আরজ আলী মাতুব্বর চলে গিয়েও এই কাজটা বেশ করেন। হঠাৎ মানুষকে অনমনস্ক করে তোলেন। কেন?

আলী নুর প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে থাকেন।

AMARBOI.COM

গ্যালিলিও চেয়ারে বসে দূরবীণ নাড়াচাড়া করছেন, মেঝেতে মাঝে মাঝে পা ঠুকছেন। তাঁকে বেশ অস্থির দেখাচ্ছে। হাত দিয়ে পাশের টেবিলে রাখা বইগুলি স্পর্শ করলেন। কিছুক্ষণ বইয়ের উপর হাত রাখার পর ডাক দিলেন, ভার্জিনিয়া, ভার্জিনিয়া।

ভার্জিনিয়া রান্না করার এপ্রোন নিয়ে ঘরে ঢুকল। বলল, ক্ষিধে পেয়েছে? এই তো আনছি।

না। ক্ষিধে পায়নি।

তবে ডাকলে যে?

আমার অস্থির লাগছে। কিছু ভালো লাগছে না।

কেন? ভার্জিনিয়া পিতার কাঁধে হাত রাখল। গ্যালিলিও বললেন, আমার দৃষ্টিশক্তি এখন প্রায় নেই বললেই চলে। আমি পড়তে পারছি না।

কেন পিতা, আমি তো তোমাকে বই পড়ে শোনাচ্ছি। যখন বই পড়তে চাইছ, পড়ে শোনাচ্ছি। দৃষ্টিশক্তি হারিয়ে ফেলছ বলে দুঃখ করো না।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

দৃষ্টিশক্তি যার আছে সে বুঝবে না দৃষ্টিহীনতার দুঃখ।

তোমার রয়েছে অন্তর্দৃষ্টি ভার্জিনিয়া গাঢ়স্বরে বলে।

অন্তর্দৃষ্টি? কি হবে অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে। আমি লিখতে পারছি না কিছু।

কেন, তুমি বলে যাও আমি লিখে যাচ্ছি। তোমার লেখা তো বন্ধ নেই।

তা নেই। কিন্তু সে সব লেখাই তো চার্চের হাতে চলে যাচ্ছে, তাদের প্রহরী সন্ন্যাসীর দৃষ্টি থেকে কিছু লুকানো যাচ্ছে না। কি লাভ এইভাবে লিখে?

তুমি তোমার শ্রেষ্ঠ লেখা, জীবনের সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ কাজ লুকাতে পেরেছ।

কোনটা? গ্যালিলিও বই থেকে হাত তুলে নেন।

ডিসকর্সি। যা তুমি আন্দ্রিয়াকে দিয়েছ। সে নিশ্চয়ই সীমান্ত পার হয়ে নিরাপদে পৌঁছে গেছে হল্যান্ডে। সেখান থেকে তোমার পাণ্ডুলিপি কপি এখন সম্ভবত লন্ডন, প্রাগ, আমস্টার্ডামের পণ্ডিতদের হাতে হাতে ঘুরছে।

তোর তাই মনে হয়? গ্যালিলিও হাসি মুখে দেখতে চেষ্টা করেন কন্যাকে।

হ্যাঁ। আমি নিশ্চিত যে তোমার গবেষণার ফলাফল, ঐ পাণ্ডুলিপি এখন জ্ঞানের নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করেছে। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাধনায় যারা নিয়োজিত তারা শ্রদ্ধাভরে তোমাকে স্মরণ করছে।

কিন্তু ফ্লোরেন্সে আমার যারা ছাত্র আর অনুরাগী ছিল তারা মনে করে আমি বিজ্ঞানের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছি। আমি ভুল স্বীকার করে চার্চের বন্দিশালা থেকে মুক্তি নিয়ে আসার পর দেখেছি তো কিভাবে আমার সহকর্মীরা আমাকে ধিক্কার দিয়েছে। এখনো দিচ্ছে।

ভবিষ্যতে দেবে না।

ভবিষ্যত? গ্যালিলিও ডান হাত তাঁর চোখের সামনে তুলে আনেন। স্বগতোক্তির মতো বলেন, এই হাতে 'ডিসকর্সি' লিখেছি। আবার এই হাতেই ভুল স্বীকারোক্তি হলফনামায় স্বাক্ষর করেছি। কী কলঙ্কিত এই হাত!

কিন্তু তুমি তো সেই হাতেই 'ডিসকর্সি' কপি গোপনে আবার লিখেছ। লুকিয়ে রেখেছ গ্লোবের ভেতর। আন্দ্রিয়াকে দিয়েছ ইতালির বাইরে পাচার করার জন্য।

হ্যাঁ, তা করেছি। এই হাত কলঙ্কিত হয়েছে আত্মসমর্পণের মুচলেকা লিখে। কিন্তু শূন্য হয়নি, অলস হয়ে থাকেনি।

গ্যালিলিও ধীরে ধীরে তাঁর ডান হাত চোখের খুব সামনে আনেন। খুব মনোযোগ দিয়ে দেখতে থাকেন।

মঞ্চে আলো নিভে তারপর জ্বলে ওঠে। প্রেক্ষাগৃহে করতালি। দর্শকরা বেরিয়ে যাবার জন্য উঠছে। মঞ্চে নাটকের সব লব-কুশ। আলী যাকের, সারাহ্ যাকের, আতাউর রহমান।

আলী নুর হাসনাতের দিকে তাকিয়ে বললেন, চলুন যাওয়া যাক।

হাসনাত নিজের মনে বলার ভঙ্গিতে বলল, শূন্য মঞ্চ খুব বিষণ্ন দেখায়।

কেন? আলী নুর তাকালেন।

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~

শূন্য বলে। হাসনাত বলল। কল্পনা করা যাক। এইতো দেখতে পাচ্ছি সক্রেটিস, গ্যালিলিও মঞ্চে। তারপর আস্তে করে বললেন আরজ আলী মাতুব্বরও আছেন।

কী বললেন? হাসনাত ঝুঁকে তাকালেন তার দিকে।

আলী নুর অন্যমনস্কের মতো বললেন, কিছু না।

AMARBOI.COM

দুনিয়ার পাঠক এক হও! ~ www.amarboi.com ~